সেকালের লোক

"বর্ত্তমানের দীপ্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল, মনোরম, সন্দেহ নাই, কিন্তু অতীতের অন্ধকারও পবিত্র ; বর্ত্তমান অতীতকে আবরণ করিয়া যে যবনিকা বিস্তৃত করিয়াছে, তাহার অন্তরালে আমাদের পূর্ব্বগামীদের যত্ন-সঞ্চিত রত্ন আছে, [illegible] ভুলিয়া না যাই।"—

সুরেশ সমাজপতি।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

M. A., F. S. S., F. R. E. S.,

বিরচিত।

কলিকাতা

১৩৩০ বঙ্গাব্দ

[মূল্য দেড় টাকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার-শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

অসেচনক

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে I. C. S., B. A.

করকমলেষু।

ছোটমামা,

ছেলেবেলায়, আমরা দু'জনে জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া কাগজ কিনিয়া 'Grandfather'এর জন্য খাতা বাঁধিতাম। আমরা দু'জনে তাহার লেখক, আমরা দু'জনে তাহার সম্পাদক, আমরা দু'জনে তাহার চিত্রকর, আমরা দু'জনে তাহার পাঠক, এবং আমরা দু'জনেই তাহার সমালোচক ছিলাম। তাহার পর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে! আজ তুমি কত বিদ্যা আহরণ করিয়া, কত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া, নানাদিকে তোমার প্রতিভা বিনিয়োজিত করিয়া, জীবন সার্থক করিতেছ। আমি কূপমণ্ডূকের ন্যায় বিফল জীবন যাপন করিতেছি। আমার এই অকিঞ্চিৎকর রচনাগুলি আজি তোমারও নিকট পাঠাইতে সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি। কিন্তু জীবনের দিনগুলি একে একে চলিয়া যাইতেছে। আমার এই ব্যর্থ জীবনের যত অপূর্ণ আশা,

যত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, যাহার মধ্যে সফলতালাভ করিতে দেখিব ইচ্ছা করিয়াছিলাম, ভগবানের অলঙ্ঘনীয় বিধানে তাহাকেও জন্মের মত হারাইয়া আমি আজ ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিতেছি। এই দুর্ব্বিষহ জ্বালাময় জীবন আরও কতকাল বহন করিতে হইবে জানি না। বর্ত্তমানের নৈরাশ্য এবং ভবিষ্যতের অন্ধকার হইতে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি অতীতের দিকে সঞ্চালিত করিতে ইচ্ছা হয় এবং সেই অতীতের মধ্যে তোমার স্মৃতিবিজড়িত বাল্যকালের মধুর দিনগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সেই দিনগুলির স্মৃতি আমার নিকট বড় প্রিয়। তাই তাহার সহিত আমার এই অকিঞ্চিৎকর রচনাগুলি সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিলাম। ইতি

চিরানুগত

মন্মথ।

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থের অন্তর্গত জীবনচরিতবিষয়ক প্রস্তাবত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুইটি "মানসী ও মর্ম্মবাণী" এবং তৃতীয়টি "যমুনা" নামক মাসিকপত্রে, পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছিল। এক্ষণে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইল।

প্রবন্ধগুলি যে ভাবে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিবার অভিপ্রায় ছিল, শরীরের ও মনের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কিছুই সম্ভবপর হইল না।

১।৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১লা বৈশাখ ১৩২০। } শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

হেমচন্দ্র সম্বন্ধে অভিমত—

বসুমতী—এরূপ বিস্তৃত চরিতকথা সচরাচর লক্ষিত হয় না; এবং ইহাতে গ্রন্থকার যে অনুসন্ধিৎসার ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

ভারতবর্ষ—কবিবর হেমচন্দ্রের কাব্যের ন্যায় তাঁহার জীবন-কথাও আদৃত হইবে।

ভারতী—লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও বিষয় সমাবেশে বেশ দক্ষতা আছে। সংগৃহীত বিষয়ের কতটুকু ছাঁটিয়া কতটুকু প্রকাশ করা উচিত, সে বিচার শক্তিরও পরিচয় পাই। ভাষা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর—জীবনীলেখকের এই কয়টি প্রধান গুণ থাকা প্রয়োজন। মন্মথবাবুর তাহা আছে এবং গ্রন্থখানি সাধারণের পক্ষে তিনি উপভোগ্য ও সরস করিতে পারিয়াছেন।

সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—

"হেমচন্দ্র" লিখিয়া আপনি বঙ্গসাহিত্যের একটি বৃহৎ অন্ধকার কক্ষ চিরালোকিত করিলেন। * * আপনার ভাব, ভাষা, চিন্তা, সর্ব্বোপরি কবির প্রতি গভীর সহানুভূতি অথচ সত্যের প্রতি দৃঢ়ানুরাগ আমার আন্তরিক অভিনন্দন বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। 'মানসী'তে যখন এই লেখাগুলি মাসে মাসে বাহির হইত, আমি পড়িবার জন্য সাগ্রহে ও সসম্ভ্রমে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম। আপনার তথ্যসংগ্রহে কাব্য সমালোচনায় ও সে সময়কার সামাজিক ও সাহিত্যিক চিত্রাঙ্কণে বেশ একটু নূতনত্ব আছে, সেই মৌলিকতার মোহিনীটুকু আমাকে বড়ই স্পর্শ করিয়াছে। আপনি এমন কতকগুলি অজ্ঞাত বিস্মৃতপ্রায় পুরাতন কথা সুধীসমাজে নূতন বেশে উপস্থিত করিয়াছেন, যাহা বঙ্গবাণী হারানিধির ন্যায় চিরদিন তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষা করিবেন।

MEMOIRS OF KALI PROSSUNNO SINGH

BY

MANMATHA NATH GHOSH. M. A., F. S. S., F. R. E. S.

(Price R. 1/8 only).

The Times Literary Supplement.—Some five years ago, Mr. Ghose published in Bengali a brief biography of the talented youth who died just fifty years ago at the age of twenty-nine and left behind him not only a Bengali translation of the whole of the Mahabharata but that remarkable work of satirical fiction " Hutum Pechar Naksha", as epoch-making in Bengali literature as was, say, 'Joseph Andrews' in ours. Mr. Ghosh has now issued a translation of his Bengali work into English, not so much with a view of reaching an audience in England as in the hope of making his fellow-countryman known in parts of India where Bengali is a more foreign tongue than English itself. Mr. Ghosh has done well to place on record what is known of the parthetically brief and briliant career of this gifted lad. * * He gives the few facts that are necessary and his book can be read swiftly and with sufficient enjoyment. The passages relating to the Rev. Mr. Long and his once famous trial for libel (because he published a translation of Dina Bandhu Mitra's 'Mirror of Indigo') have a more than ephemeral interest and may be of use to future historians of Bengal."



I. The Life of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the *Hindoo Patriot* and the *Bengalee*. By one who knew him. Edited by his grandson Manmathanath Ghosh M. A.

Royal Octavo, Cloth, 239 pages with 4 illustrations. Price Rs. 2-8 only.

II. Selections from the writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the *Hindu Patriot* and the *Bengalee*. Edited by his Grandson Manmathanath Ghosh, M. A.

Royal Octavo. Cloth 693 Pages with Facsimile of handwriting. Price Rs. 5 only.

The two Volumes, nicely bound together, will for a very short time, be sold at Rs 5 only.

OPINIONS

The late Sir *Henry Cotton, K. C. S. I.*—"I have been reading with very great interest your life of your grandfather which you so kindly sent me. Among other things it is one of the best records of Calcutta life during its most interesting period that I have come across."

"I feel the greatest admiration for the general character of your grandfather'd wrtings and for the high moral tone any political insight they display. They amplr confirm the impression I have always ented tained of his ability and literary gifts, and show how great was the loss Bengal sustaines by his premature death."

DEATHLESS DITTIES.

BY

ATUL CHANDRA GHOSH.

Bengalee—This is a nice booklet containing the translations into English verse of the poems of Chandidas, Vidyapati, Boloram Das, Jnan Das, Nitai Das and other Vaishnav poets. The translator has also conveyed to the English reading public the beauties inherent in some of the well-known songs of Nidhu Babu, Ram Basu, Ray Sekhar, Laksmi Narain Chackerbutty and Kedar Nath Chowdhury. But he does not concern himself with old poets alone. The exquisite translations he gives of the songs of Bankim Chandra Chatterjee, Sanjib Chandra Chatterjee, Grish Chandra Ghose, Jyotirindra Nath Tagore and, last but not least, of Rabindra nath Tagore, will be a source of perennial joy and inspiration to the reader. We wish we had space to reproduce the translation of 'Bande Mataram', which is far and away the best translation of this immortal patriotic song, the 'Marseillaise' of India. The translator has succeeded in a remarkable measure in keeping up the spirit of the original. The luscious beauty, the captivating music, the longing yearnings, the sweet pathos of the Vaishnab poets have lost nothing in the process of translation. This stands greatly to the credit of Mr. Ghose who is a consummate master of the art of English versification. The ideals and inspiration and joy of the modern poets have also found glorious expression through the vehicle of his jingling verses, so charming to the ear and the heart of the reader. (Price Rupee One only)

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী



কৈলাসচন্দ্র বসু

সেকালের লোক

মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু

উপক্রমণিকা। এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে আমাদের মৃতপ্রায় সমাজে এক নূতন জীবনস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল। কি ধর্ম্ম সংস্কারে, কি সমাজ সংস্কারে, কি শিক্ষাবিস্তারে, কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে, নূতন ও মহান্ আদর্শ বহন করিয়া অনেকগুলি একনিষ্ঠ সাধক অবিচলিত উৎসাহ, অসীম আগ্রহ, অসাধারণ সহিষ্ণুতা, ও প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সহিত, অপূর্ব্ব প্রতিভা ও অতুল শক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে যুগে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ধর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছিল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র

ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী রাজনীতিকগণ আবির্ভূত হন, রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করেন, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণের উদ্ভব হয়, সেই অসামান্য মানসিক উদ্দীপ্তির যুগের বিস্তৃত ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইতিহাসের অভাবেই হউক বা উপকারকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অভাবেই হউক, যে সকল অগ্রণীর হৃদয়-শোণিতে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ পুষ্ট হইয়াছে, শিক্ষা-প্রণালী উন্নত হইয়াছে, রাজনীতিক অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে, জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই আমরা তাঁহাদের অনেকেরই সাধনা ও আত্মত্যাগের কথা, অনেকেরই কীর্ত্তি-কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছি। যে প্রতিভাশালী বাঙ্গালীর নাম লইয়া আজি আমরা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার নাম আজ অনেকের নিকটেই অপরিজ্ঞাত। অথচ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই অকৃত্রিম সাহিত্যসেবক, দেশপ্রিয় বাগ্মী ও স্থিতপ্রজ্ঞ জননায়কের নাম শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিত্যস্মরণীয় ছিল। বেথুন সোসাইটি

নামক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সভার সুযোগ্য সম্পাদকরূপে তিনি দীর্ঘকাল য়ুরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ বিরাজিত ছিলেন। তিনি শক্তিশালী লেখক ছিলেন এবং যেখানেই তিনি দেখিতেন—

"দুর্ব্বল হইছে চূর্ণ প্রবলের বিজয় গৌরবে"

সেই খানেই তিনি দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সমগ্র শক্তির সহিত প্রবলকে আক্রমণ করিতেন। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য, তিনি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ঢক্কানিনাদে আত্ম-ঘোষণা না করিয়া তিনি নীরবে যথাশক্তি দেশের সেবা করিতেন। তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত জননায়কগণই চরিত্রের মহত্ত্বে, নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্যে, নির্ভীক দেশপক্ষ-সমর্থনে, অপূর্ব্ব ন্যায়নিষ্ঠায় য়ুরোপীয়দিগের নিকট আমাদের জাতীয় সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহাদিগকে সমগ্র জাতির প্রতি শ্রদ্ধা-পরায়ণ করিয়াছিলেন; তাহাতে দেশের যে কি মহদুপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের সামাজিক ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবে। আমরা দীর্ঘ ভূমিকা অপ্রয়োজনীয় বোধে সংক্ষেপে এই বিস্মৃতকীর্ত্তি বাঙ্গালীর পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইব।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র কলিকাতার একটি অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ দেওয়ান ভবানীচরণ বসু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সমসাময়িক সমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র ছিল এবং দানশীলতার জন্য তিনি তাৎকালীন সমাজে সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী ছিলেন এবং শিষ্টাচারে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্ত অতি বিরল ছিল। দরিদ্র-পালন ও অতিথি-সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার অতিথিশালায় যত অতিথি আসিতেন কেহই বিফল-মনোরথ হইতেন না, সকলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিতেন। শুনা যায়, অতিথিগণের নিক্ষিপ্ত পাতা ও গেলাসে অতিথিশালার পুষ্করিণীটি প্রায় বুজিয়া গিয়াছিল। তিনি সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া বিষয়কার্য্য করণান্তর, সন্ধ্যাকালে অতিথি কেহ অভুক্ত আছেন কি না দেখিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন। ভবানীচরণের পত্নী ভুবনেশ্বরীও তাঁহার স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ভবানীচরণের চারি পুত্র—রামনিধি, রামতনু, রামমোহন ও ফকীরচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ রামনিধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য্য

করিতেন। ইনিও পিতার ন্যায় চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। ইঁহাদের বাটীর সম্মুখস্থ রামতনু বসুর লেন, মধ্যম ভ্রাতা রামতনুর সামাজিক প্রতিপত্তির পরিচায়ক। রামনিধির চারি পুত্র ছিল—জ্যেষ্ঠ হরলাল, মধ্যম দুর্গাচরণ, তৃতীয় নন্দলাল ও কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র। হরলালের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ কৈলাসচন্দ্র ও কনিষ্ঠ যদুনাথ। জ্যেষ্ঠ কৈলাসচন্দ্রের জীবন-কাহিনী বিবৃত করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা। শৈশবে কৈলাসচন্দ্র নবীন মাধব দে কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন। তাঁহার ছাত্রজীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী ও উহার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা এইস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

উচ্চশিক্ষা। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী ও গৌরমোহন আঢ্য। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারি দিবসে গৌরমোহন আঢ্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। বাল্যকালে তিনি সামান্য শিক্ষাই প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি সাধু ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বদেশপ্রেম ও

জনহিতৈষণার জন্য, বিশেষতঃ এতদ্দেশে ইংরাজীশিক্ষা বিস্তারের একজন প্রধান উদ্যোগী বলিয়া, তিনি দেশবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে Calcutta Literary Observer নামক অধুনাবিলুপ্ত একটি পত্রে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈমাসিকের ত্রয়োদশ খণ্ডে একজন লেখক তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের 'কলিকাতার ইতিহাসে' উহা পুনরুক্ত হইয়াছে। আমরাও এস্থলে উহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না:—

"সপ্তবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি (গৌরমোহন) উপার্জ্জনের অন্য কোন সুবিধাজনক পথ না দেখিয়া স্বদেশীয়দিগের নিমিত্ত একটি স্কুল স্থাপন করিলেন এবং কয়েক বৎসর অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার ছাত্র-সংখ্যা যখন প্রায় ২০০ হইয়া উঠিল, সেই সময়ে তিনি টার্ণবুল নামক এক সাহেবকে অংশী করিয়া লইলেন। ইহার পর ক্রমশঃই তাঁহার স্কুলের উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার অংশীর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার নিজ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি অতি দক্ষতার সহিত নিজ তত্ত্বাবধানে স্কুলের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি হার্ম্মান জিওফ্রে নামক একজন দুঃস্থ ব্যারিষ্টার প্রাপ্ত হন;

সেই ব্যারিষ্টারের উৎকৃষ্ট শিক্ষায় গৌরমোহনের স্কুল বিলক্ষণ প্রাধান্য লাভ করিল। গৌরমোহনকে দেখিলেই ধর্ম্মভীরু বলিয়া বোধ হইত, তিনি এরূপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি প্রথম শ্রেণীর বালকদিগকে অকপটে বলিয়া ফেলিতেন যে, আমি তোমাদিগকে পড়াইতে পারি না। ঘৃণা অভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। যাহা তিনি জানিতেন, তাহা অন্য সমস্ত দেশীয় শিক্ষক অপেক্ষা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তিনি অতি মৃদুস্বভাব ছিলেন; আশ্চর্য্যের বিগ্ন এই যে, নানা প্রকার স্বভাব ও মেজাজের লোকের সহিত তাঁহাকে কার কারবার করিতে হইলেও তিনি অতি সুকৌশলে আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি কখনও কাহারও বিরাগভাজন হন নাই। তিনি ছাত্র মণ্ডলীর অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন; আর যদিও তিনি নিয়মানুগামিতা ও বশংবদিতা সম্বন্ধে কঠোর শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এবং যদিও তাঁহাকে এমন অনেক স্বেচ্ছাচারী বালককে লইয়া চলিতে হইত যাহাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু তথাপি তিনি সকলেরই সম্মানভাজন ও অনেকের প্রণয়াস্পদ হইয়াছিলেন।" *

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের লেখক লিখিয়াছেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উক্ত

* রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের "কলিকাতার ইতিহাস।"
৺সুবলচন্দ্র মিত্রের অনুবাদ।

বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বিবরণী প্রভৃতি হইতে প্রতীত হয় যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ দিবসে উহা স্থাপিত হয়। বোধ হয় এই সময়েই টার্ণবুল সাহেবের মৃত্যু হয় এবং গৌরমোহন বিদ্যালয়ের একমাত্র সত্ত্বাধিকারী হন। যাহা হউক, গৌর-মোহনের প্রযত্ন ও চেষ্টাতেই এই বিদ্যালয় অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করে এবং এই বিদ্যালয় বরাবর 'গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল' বলিয়াই পরিচিত।

গৌরমোহন তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। উৎকৃষ্ট বালকগণকে তিনি প্রয়োজন হইলে বিনাবেতনে শিক্ষা দিতেন এবং তাহাদের কেহ কোনও দিন অনুপস্থিত হইলে স্বয়ং তাহার বাটীতে গিয়া সংবাদ লইতেন। প্রত্যেক ছাত্রের চরিত্রের প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুশিক্ষা প্রদানের জন্য ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী অসামান্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর হিন্দু ছাত্রগণ স্বাধীনচিন্তা শিক্ষা করিয়া যে ভাবে হিন্দুসমাজের বক্ষে শেলাঘাত করিয়া চিরানুসৃত আচারাদি পদদলিত করিতেছিলেন, সংস্কারের নামে যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহাতে হিন্দু অভিভাবকগণ সন্তানদিগকে উচ্চ ইংরাজীশিক্ষা প্রদান করিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডফ্

প্রভৃতি প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ হিন্দু বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা প্রদানের সহিত যে ভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল করিয়া দিতেছিলেন তাহা দেখিয়া হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও এই জন্য সকল হিন্দু অভিভাবক সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে তাদৃশ উৎসুক ছিলেন না। গৌরমোহন আঢ্যের চেষ্টাতেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার আদর বাড়িয়াছিল। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়াও স্বধর্ম্ম ও দেশাচার পরিত্যাগ করেন নাই। বিদ্যার সহিত বিনয় ও শিষ্টাচার সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে সমাজের যথার্থ অলঙ্কাররূপে পরিণত করিয়াছিল। যে বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক অক্ষয়কুমার দত্ত, হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশব্রত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মহাত্মগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী যে কিরূপ উৎকৃষ্ট ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে কেবলমাত্র স্কুল পাঠ্য গ্রন্থাদি পঠিত হইত না; আজিকালি উচ্চশ্রেণীর কলেজে যে উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হয়, ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর প্রথম শ্রেণীতে

সেইরূপ উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইত। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র স্কুলপাঠ্য পুস্তক পড়ান হইতেছে। যাহাতে ছাত্রগণ বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী পড়িতে ও লিখিতে পারেন সেই দিকে গৌরমোহনের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বল্পবেতনে সঙ্গতিহীন অথচ কৃতবিদ্য য়ুরোপীয় শিক্ষক সংগ্রহ করিতেন এবং নিম্নতম শ্রেণীতেও বালকদিগকে ইংরাজ শিক্ষকের দ্বারা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাপ্রদান করিতেন। ফলে, শৈশব হইতেই বালকগণ ইংরাজী শব্দ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে শিখিত।

যে সময়ে কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হন, সেই সময়ে হার্মান জেফ্রয় নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। য়ুরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় ইঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি প্রথমে ব্যারিষ্টার হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন কিন্তু অত্যধিক পানদোষ থাকায় ইনি ব্যারিষ্টারিতে প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই এবং নিতান্ত দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। গৌরমোহন ইঁহাকে এক-শত মুদ্রা বেতনে স্বীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। হার্মান জেফ্রয় তাঁহার ছাত্রগণকে অতিশয় যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার একজন ছাত্র তাঁহার

আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে এক এক দিন তিনি প্রমত্ত অবস্থাতেও ইংরাজী গ্রন্থাদি হইতে সুন্দর সুন্দর অংশের এরূপ মনোহর আবৃত্তি করিতেন যে তদ্দ্বারা তাঁহার ছাত্রেরা যথেষ্ট উপকৃত হইতেন। গৌরমোহন বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগারেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের ছুটির পরেও তথায় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইতেন। হার্মান জেফ্রয়ের সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের একটি তর্কসভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইস্থানে শম্ভুনাথ পণ্ডিত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছাত্রাবস্থায় বিচার ও তর্ক করিবার শক্তি অর্জন করিতেন।

গৌরমোহন আঢ্য সম্বন্ধে আমরা এত অল্প জানি যে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ তৎসম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই মার্চ্চ দিবসে তাঁহার ও তাঁহার বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদ করিলে, আশা করি পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই ঃ

"কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির চেষ্টা ও উদ্যম কিরূপে জনসাধারণের কুসংস্কার ও ঔদাসীন্য পরাভূত এবং শিক্ষার আদর্শ উন্নত করিতে পারে তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর

ইতিহাসে যেরূপ পরিলক্ষিত হয় সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এই সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপয়িতা একণে ইহলোকে নাই। যে মহৎকার্য্য তিনি তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যেই তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহার অদৃষ্ট তাঁহাকে অন্যভাবে পরিচালিত করিত তাহা হইলে হয়ত তিনি একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ হইতে পারিতেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে অবশ্যই তিনি অসামান্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য স্তূপ হইতে তিনি উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রসংখ্যা এক শতও ছিল কি না সন্দেহ, তাঁহার মৃত্যুকালে উহার ছাত্রসংখ্যা আটশত হইয়াছিল এই বিদ্যালয় কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে এবং উহা তাঁহার অবিচলিত উদ্যম ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। হিন্দু কলেজ ও মিশনারী বিদ্যালয়গুলির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বতা উহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, উহার পরলোকগত প্রতিষ্ঠাপয়িতা যে উত্তম শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে উহা সর্ব্বসাধারণের নিকট যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। সুকুমারমতি বালকগণের মনে উচ্চ নৈতিক ভাব অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অমায়িক ও নির্ম্মল স্বভাব, এবং চরিত্রগত বিবিধ সদ্গুণাবলীর সুদৃঢ় ভিত্তি নির্ম্মিত করিয়া দেওয়াই এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, দাম্ভিক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির পরিবর্ত্তে বুদ্ধিমান এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ নাগরিকের সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল এবং এই

উদ্দেশ্য অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লর্ড অকল্যাণ্ড এডওয়ার্ড রায়ানের সহিত এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ও লর্ড জোসলিন বিদ্যালয়ের তরুণ বয়স্ক ছাত্রদিগের সাহিত্যে অধিকার ও ব্যুৎপত্তি দেখিয়া যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সে কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল এ কথাও বলিয়াছিলেন যে এই বিদ্যালয় হিন্দু কলেজ হইতে কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট নহে। গবর্ণমেণ্ট কলেজে যে সকল সুবিধা আছে এখানে তাহা নাই, তথাপি যে উহা গবর্ণর জেনারেলের নিকট এরূপ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে ইহা নিশ্চিত অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের ইংরাজীতে যথেষ্ট অধিকার থাকিলেও তিনি গণিতশাস্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না। সেই জন্য বাৎসরিক পরীক্ষায় গিরিশচন্দ্র প্রতিবারই দ্বিতীয় স্থান এবং কৈলাসচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। উভয়েরই সুন্দর আবৃত্তিশক্তি ছিল। তাঁহাদের সেক্ষপীয়রের আবৃত্তি যাঁহারা শুনিতেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইতেন। প্রসিদ্ধ বক্তাদের বক্তৃতাভঙ্গী অনুকরণ করিবার কৈলাসচন্দ্রের অসামান্য ক্ষমতা ছিল। কৈলাসচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র যে ভবিষ্যতে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন তাঁহাদের শিক্ষক-

গণ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল।

হস্তলিখিত সাময়িক পত্র। ছাত্রাবস্থায় কৈলাসচন্দ্র বিদ্যালয়ে এক হস্তলিখিত সাময়িক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। কৈলাসচন্দ্র, তাঁহার সতীর্থ গিরিশচন্দ্র এবং গিরিশ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম অগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র ও শ্রীনাথ (যিনি পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন) এই পত্রে সুন্দর সুন্দর সন্দর্ভাদি লিখিতেন। কৈলাসচন্দ্রের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে সেই সকল প্রবন্ধ একটি খাতায় নকল করিয়া পত্রিকাখানি সহপাঠিগণকে পাঠ করিতে দিতেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি দিবসে গৌরমোহন আঢ্য পরলোকে গমন করেন। গৌরমোহন বাল্যকাল হইতে জলপথে ভ্রমণ করিতে ভয় পাইতেন, কারণ তিনি সন্তরণ জানিতেন না। জীবনে একবার মাত্র তিনি বিদ্যালয়ের জন্য একজন য়ুরোপীয় শিক্ষকের অন্বেষণে শ্রীরামপুরে জলপথে গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ঝটিকাবেগে তাঁহার ক্ষুদ্র নৌকা উল্‌টাইয়া যায় এবং গৌরমোহন জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। গৌরমোহন আমাদের দেশে



গিরিশচন্দ্র ঘোষ (তরুণ বয়সে)

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্মৃতি তাঁহার কৃতজ্ঞ দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী বাস্তবিকই গৌরমোহনের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিছুদিন হইল বঙ্গেশ্বর স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর গৃহে গৌরমোহনের একটী প্রস্তরময় স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মহাত্মার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

পিতৃবিয়োগ। গৌরমোহনের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কৈলাসচন্দ্র উচ্চতম শিক্ষালাভের জন্য হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অধিককাল তিনি হিন্দুকলেজে পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার পিতার অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্রের পিতৃব্যগণ পৃথক হইলেন। অল্প বয়সেই কৈলাসচন্দ্র অভিভাবকশূন্য হইয়া নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি অল্প বয়সেই কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন।

কর্ম্মজীবনে প্রবেশ। তিনি প্রথমে মেসর্স ককারেল্ এণ্ড কোম্পানীর (Messrs. Cockerell

& Co.) আফিসে একটি সামান্য কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। পরে, বোধ হয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে, তিনি মিলিটারি একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আফিসে তদানীন্তন রেজিষ্ট্রার মিষ্টার হিলের অধীনে একটি কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই সময়ে নিমতলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত ফ্রী চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনের গৃহে প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক ও বাগ্মী রেভারেণ্ড ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্‌ খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কৈলাসচন্দ্র সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া অপূর্ব্ব তর্ক-শক্তি দ্বারা আলেক্‌জাণ্ডার ডফের যুক্তিগুলির ভ্রম প্রদর্শন করিতেন। তরুণ বাঙ্গালী যুবকের এই অদ্ভুত তর্কশক্তি অবলোকন করিয়া সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইতেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজীতে Christianity, what is it? বা "খ্রীষ্টধর্ম্মের স্বরূপ কি?" শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন। এই স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে কৈলাসচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান সভ্যগণ বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্ম-গ্রন্থাদিতে শিক্ষাদানের জন্য তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামক যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, কৈলাসচন্দ্র উহাতে কিছুকাল হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

লিটারারী ক্রনিক্‌ল্‌। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র 'The Literary Chronicle' নামক এক-খানি ইংরাজী মাসিক-পত্রিকা প্রবর্ত্তিত করেন। সেপ্টেম্বর মাসে উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদকতায় এই পত্রিকাখানি শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজে যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। পত্রিকাখানি কিঞ্চিদধিক দুই-বৎসর কাল প্রকাশিত হয়। পরে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। কৈলাসচন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ ও সহচর গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই পত্রিকায় অনেকগুলি সুন্দর প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। সে প্রস্তাবগুলিতে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে তিনি সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির আলোচনা করিতেন। প্রথম সংখ্যায় তিনি East India Company's Policy বা "ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কোম্পানীর সর্ব্বগ্রাসিনী নীতির যে ন্যায় ও যুক্তি সমন্বিত অথচ কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। মৎসম্পাদিত "Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee" নামক গ্রন্থে এই প্রস্তাবটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কৈলাসচন্দ্রের অনেকগুলি

মনোজ্ঞ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হিন্দু ও য়ুরোপীয় নাটক সম্বন্ধে তাঁহার একটি সুন্দর প্রবন্ধ এই পত্রিকায় পড়িয়াছি বলিয়া আমাদের স্মরণ হয়। এই পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট ইংরাজী কবিতাও প্রকাশিত হইত। 'রেইস এণ্ড রায়ত' সম্পাদক শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সাহিত্য-গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি বিস্তৃত জীবন চরিত লিখিবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকাশিত 'Notes' হইতে প্রতীত হয় যে কৈলাসচন্দ্রের Literary Chronicle পত্রে গিরিশচন্দ্র শিখ যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাণোন্মাদিনী কবিতা লিখিয়াছিলেন। কৈলাসচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোনও দেশীয় ব্যক্তি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কৈলাসচন্দ্র অগ্রণী ছিলে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী আজ এই কৃতী পুরুষের নাম পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছে।

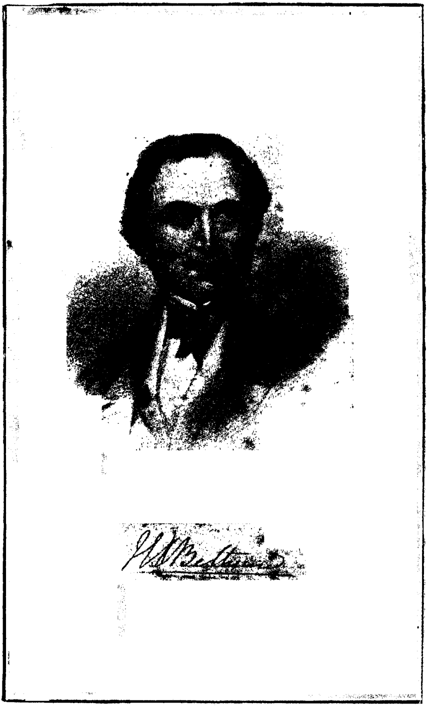
'চার্টার' সভা। কৈলাসচন্দ্র কেবল সুলেখক ছিলেন না। তাঁহার অপূর্ব্ব বক্তৃতাশক্তি ছিল। জনহিতকর প্রকাশ্য সভা সমিতিতে তিনি প্রায়ই উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন দিবসে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি সার চার্লস উড্ হৌস্ অব্

কমন্স সভায় ভারতবর্ষীয় রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ বিষয়ক একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তখন কি কি সর্ত্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন চার্টার বা সনন্দ প্রদত্ত হইবে, কমন্স সভায় তাহা আলোচিত হইতেছিল। স্যর চার্লসের প্রস্তাবটী কতিপয় বিষয়ে অতি উত্তম হইলেও অনেক বিষয়ে উহা শিক্ষিত ভারতবাসীর আশার অনুরূপ হয় নাই। উহাতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং সিবিল সার্ভিসে ভারত-বাসীর নিয়োগ, বিচার বিভাগে দেশীয় কর্ম্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধি, লাভজনক পূর্ত্তকার্য্যের বিস্তার প্রভৃতি অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ ছিল না। এই সকল বিষয়ে এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বাঙ্গালার জননায়কগণ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জুলাই দিবসে টাউন হলে এক বিরাট সভা আহূত করেন। উহার পূর্ব্বে এদেশে কোনও প্রকাশ্য সভায় এত জনতা হয় নাই। টাউনহলে ও উহার সন্নিহিত স্থানে যে লোকসমাগম হইয়াছিল তাহার সংখ্যা সম্বন্ধে ৩০০০ হইতে ১০০০০ পর্য্যন্ত নানালোকে নানাপ্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ সকল সম্প্রদায়ের সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক ব্যক্তিকে স্থানাভাবে নিরাশ হৃদয়ে

গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, রামগোপাল ঘোষ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র দত্ত, প্যারিচাঁদ মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন। পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবক কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতাটি এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে এই সময় হইতেই কৈলাসচন্দ্র সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভায় এই সভার কার্য্য বিবরণী ও শিক্ষিত ভারতবাসীর একটী আবেদন পত্র * প্রেরিত হয়। ফলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার স্থানে স্থানে সংশোধিত হয় এবং ভারতবাসী সিবিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার লাভ করেন।

বেথুন সভা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর দিবসে শিক্ষাপরিষদের সভাপতি ও ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু পুণ্যশ্লোক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ডাক্তার

* সুপ্রসিদ্ধ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই আবেদন পত্রের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।



ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন

মৌয়েট এতদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সহযোগিতায় 'বেথুন' সোসাইটী নামক এক সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। † এই সভা এক্ষণে মৃত কিন্তু বহু বৎসরকাল ধরিয়া এই সভা আমাদের মানসিক উন্নতির জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছে তাহা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবে। যখন ডাক্তার মৌয়েট, ডাক্তার ডফ্, আর্চডিকন প্র্যাট, অধ্যাপক কাউয়েল, কর্ণেল ম্যালিসন, কর্ণেল গুড্‌উইন, ডাক্তর রোয়ার, ডাক্তার চেভার্স, রেভারেণ্ড ডল প্রভৃতি য়ুরোপীয় পাণ্ডিতগণ এবং গুডিব চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন

† যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি এই সভার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন এবং সর্ব্ব প্রথম এই সভার সভ্য হন তাঁহাদের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য :—

এফ্. জে. মৌয়েট এম্-ডি; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ; মেজর জি, টি, মার্সাল, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, ডাক্তার স্প্রেঞ্জার, ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তী, এল, চ্যাট. বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রাধানাথ শিকদার, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, বাবু হর-

বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, কৈলাসচন্দ্র বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবীনকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাগ্মিতায় বেথুন সভার গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত তখন সভার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! তখন গবর্ণর জেনারল, লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা বিনা নিমন্ত্রণে এই সভায় বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। কৈলাসচন্দ্র কেবল এই সভার প্রতিষ্ঠাকারী সভ্য ছিলেন না, তিনি এই সভায় বহু সারগর্ভ সন্দর্ভাদি পাঠ করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতার পরে যে তর্কবিতর্ক হইত তাহাতে প্রায়ই যোগদান করিতেন। এই সভায় সর্ব্বপ্রথমে তিনি 'A comparative view of the European and Hindu Drama' (য়ুরোপীয় ও হিন্দু নাটকের তুলনায় সমালোচনা) শীর্ষক একটী

মোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু জগদীশনাথ রায়, বাবু নবীন চন্দ্র মিত্র, বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু রসিকলাল সেন, বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র, বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র দত্ত, বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

প্রস্তাব পাঠ করেন। বোধ হয় Literary Chronicleএ প্রকাশিত সন্দর্ভটী ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াই এই প্রস্তাবটী রচিত হইয়াছিল। প্রস্তাবটী পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই সভায় তিনি The Women of Bengal (বঙ্গনারী) সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব পাঠ করেন। ইহাও পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী মিষ্টার (পরে সার) সিসিল বীডন এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এতদূর প্রীত হন যে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে একটী উচ্চবেতনের পদ শূন্য হইলে কৈলাসচন্দ্রকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র প্রায় আটবৎসরকাল বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে কার্য্য করেন।

কৈলাসচন্দ্র এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট দিবসে বেথুন সভায় কৈলাসচন্দ্র "On the Education of Hindu Females—how best achieved under the present circumstances of Hindu Society"—অর্থাৎ "হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রকৃষ্ট উপায়" সম্বন্ধে একটি মনোহর প্রস্তাব পাঠ করেন। এই

বক্তৃতায় তিনি অবান্তর কথা না বলিয়া কিরূপে তাৎকালীন সমাজের প্রতিকূল অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি এরূপ সারগর্ভ ও প্রয়োজনীয় কথায় পরিপূর্ণ ছিল যে সভা নিজব্যয়ে বক্তৃতাটি মুদ্রিত করিয়া উহার প্রচার করেন। বক্তৃতাটির উপসংহারাংশে এরূপ ওজস্বিনী ভাষায় দেশবাসীকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন যে উহা পাঠকালে মনে হয় বক্তার উচ্চ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বাক্য-গুলি নিঃসৃত হইতেছে। এইরূপ শব্দচয়ন-নৈপুণ্য ও আবেগ-ময়ী ভাষা তাঁহার সতীর্থ ও সহকর্ম্মী গিরিশচন্দ্র ঘোষ ব্যতীত আর কোনও বাঙ্গালী লেখকের রচনায় দৃষ্ট হয় না। প্রস্তাবটি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট দিবসে "হিন্দু পেট্রিয়টে' গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাবটির যে সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন মৎসম্পাদিত 'Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee নামক গ্রন্থের ২২৩-২২৬ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠকগণ এই সমালোচনাটি পাঠ করিলে কৈলাসচন্দ্রের প্রস্তাবটীর সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ হেনরী উড্রো সাহেবের মৃত্যু হইলে : কৈলাসচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে বেথুন সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, 'Laurie's Distinguished Anglo-Indians' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বেথুন সভার সম্পাদক। ডাক্তার মৌয়েট, মিষ্টার হজ্‌সন্ প্র্যাট্, কর্ণেল গুড্‌উইন, ডাক্তার বেড্‌ফোর্ড, মিষ্টার জেম্‌স্ হিউম্ প্রভৃতি মনস্বিগণ যথাক্রমে এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন দিবসে ডফ্ এই সভার সভাপতি পদে বৃত হন। ডাক্তার ডফের সভাপতিত্বে এই সভার যথেষ্ট উন্নতি হয়। সভার প্রায় প্রারম্ভ হইতে * প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। ইনি অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন সম্পাদকের পদ

* সর্ব্বপ্রথমে প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি অধিককাল এই কার্য্য করেন নাই।

ত্যাগ করেন। কৈলাসচন্দ্রের ভগ্নীর † সহিত রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেশচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হয়। কৈলাসচন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধি ও সরল স্বভাবের জন্য রামচন্দ্র তাঁহাকে পুত্রাধিক ভালবাসিতেন। তিনি অবসর গ্রহণ-কালে কৈলাসচন্দ্রকেই বেথুন সভার সম্পাদক পদের উপযুক্ত ভাবিয়া ডাক্তার ডফ্‌কে তাঁহার বিষয়ে বলেন। ফ্রিচার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনে তর্ক-বিতর্কের সময় হইতেই ডাক্তার ডফ্ কৈলাসচন্দ্রকে চিনিতেন এবং তাঁহার প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি কৈলাসচন্দ্রকে

---

† ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। বাল্য-কালে উপস্থিত কবিত্বরচনাশক্তির দ্বারা ইনি অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। কথিত আছে একবার কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহাকে "ভায়ের সহিত দেখা বৎসরের পরে" এই কবিতার পাদ পূরণ করিতে বলেন। বালিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "ঘটা করে দিব ফোঁটা অতি সমাদরে।" এই পূজনীয়া মহিলার নিকট হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক অনেক সাহায্য পাইয়াছেন এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ পাইবার আশা করিয়াছিলেন। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার সময়ে অকস্মাৎ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।



রামচন্দ্র মিত্র

সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় অষ্টাদশবর্ষ কাল এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদকত্বকালে এই সভা প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। সম্পাদকের কার্য্য অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। কৈলাসচন্দ্র কেবল দেশহিতের জন্য তাঁহার অধিকাংশ সময় নীরবে এই সভার উন্নতিকল্পে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসামান্য পরিশ্রম করিতে হইত, তিনি অম্লান বদনে সকল কার্য্য সম্পাদিত করিতেন। বেথুন সভার সকল সভাপতিই মুক্তকণ্ঠে কৈলাসচন্দ্রের কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। এরূপ প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই প্রতিপত্তি সম্পাদকের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে। বেথুন সভার প্রতিষ্ঠা কৈলাসচন্দ্রের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বেথুন সভার সুযোগ্য ও সুধী সম্পাদকের নাম শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই সুপরিচিত ও সম্মানার্হ ছিলেন। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসের অভাবে আজি তাঁহার নাম বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে!

রাজকর্ম্মে উন্নতি। ১৮৬০-১ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকার্য্যে ব্যয়সঙ্কোচের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান

করিবার জন্য Civil Finance Commission নামক অনুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত হয়। মিষ্টার (পরে স্যর রিচার্ড টেম্পল্ এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ডাক্তার ডফ্ কৈলাসচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। ডাক্তার ডফ্ স্যর রিচার্ড টেম্পালের সহিত কৈলাসচন্দ্রের পরিচয় করাইয়া দিলে স্যর রিচার্ড কৈলাসচন্দ্রের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে Finance Commission অফিসের প্রধান সহকারী নিযুক্ত করেন। কমিশনে কৈলাস চন্দ্র অতিশয়, যোগ্যতার সহিত সকল কার্য্য সম্পাদিত করেন এবং স্যর রিচার্ড টেম্পল্ তাঁহার কার্য্যের অতি উচ্চ প্রশংসা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তাৎকালীন রাজস্ব-সচিব মাননীয় মিঃ লেঙের প্রস্তাবানুসারে রাজস্ববিভাগে চারিটি উচ্চ পদের সৃষ্টি হইলে সার রিচার্ডের প্রশংসাবাক্য স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কৈলাসচন্দ্রকে উহার একটী পদ প্রদান করেন। তিনি শেষ অবধি এই পদ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন এবং কিছুকাল কণ্ট্রোলার জেনারেলের সহকারী এবং অবশেষে মণি-অর্ডার অফিসের অধ্যক্ষের (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের) পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্যর রিচার্ড টেম্পল তাঁহাকে এত স্নেহ করিতেন যে শুনা যায় যে তিনি তাঁহাকে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারীর পদের জন্য মনোনীত

করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই পদে বসিবার পূর্ব্বেই কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদ পত্রাদি। কৈলাসচন্দ্র দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্ম্ম এবং বেথুন সভার সম্পাদকের পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পাদিত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সাহিত্য-সেবা ও দেশ-সেবাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল। কৈলাসচন্দ্র সম্পাদিত লিটারারী ক্রনিক্লের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তদীয় মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ "বেঙ্গল রেকর্ডার" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রবর্ত্তিত করেন। সম্পাদকদ্বয় তরুণ বয়স্ক হইলেও তাঁহাদের প্রস্তাবাদি এরূপ সুচিন্তিত ও সারগর্ভ হইত যে 'ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া' সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টার মার্শম্যান এই প্রস্তাবাদির উচ্চ প্রশংসা করিতেন। কলিকাতার তদানীন্তন কলেক্টর মিষ্টার আর্থার গ্রোট এই সকল রচনা পড়িয়া এতদূর প্রীত হন যে তিনি ডেপুটী কলেক্টর ৺শিবচন্দ্র দেব * মহাশয়ের নিকট ইঁহাদের পরিচয়

---

* ইনি অতি সাধু ও ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ইহাঁর বাসস্থান কোন্নগরে ব্রাহ্মসমাজ, বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার, ডাকঘর, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইনি সাধারণ ব্রাহ্ম-



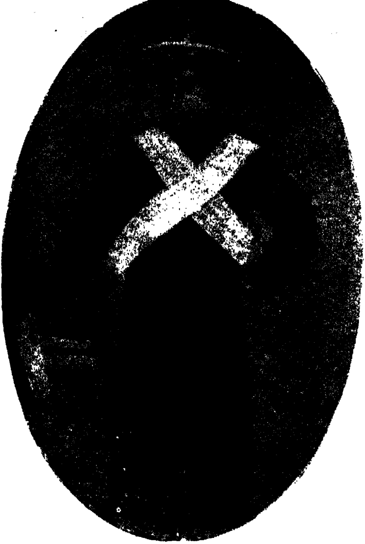
শ্রীনাথ ঘোষ।

লন এবং শ্রীনাথের অন্য কোনও চাকুরী নাই শুনিয়া তাঁহাকে একটি কর্ম্ম প্রদান করেন। শ্রীনাথ পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শেষে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্‌চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন। কৈলাসচন্দ্র "বেঙ্গল রেকর্ডারে" মধ্যে মধ্যে মনোহর প্রস্তাবাদি লিখিতেন। তিনি Morning Chronicle, Citizen, Phœnix প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Indian Field পত্রে এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার প্রথম সম্পাদক ও দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তৎপ্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাঁর রচিত 'শিশুপালন' নামক গ্রন্থ এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ বলিলে বলা যাইতে পারে। ইহাঁর সম্বন্ধে অমর কবি দীনবন্ধু লিখিয়াছেন :—

"কায়স্থ নিবাস কোন্নগর বিশাল,
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,
শিশু পালনের পিতা প্রশান্ত স্বভাব,
সুশিক্ষিতা হয় মেয়ে ভারতীর ভাব।"

শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়, সেই সূত্রে শিবচন্দ্র শ্রীনাথকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন।



কিশোরীচাঁদ মিত্র

ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত Hindoo Patriot পত্রেও তিনি মধ্যে মধ্যে দেশোন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র Hindoo Patriot এর সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা কোনও কারণে সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিলে সত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে কৈলাসচন্দ্র বসু, নবীনকৃষ্ণ বসু ও কৃষ্ণদাস পাল এই তিনজন সুলেখকের হস্তে উহার সম্পাদন ভার অর্পণ করেন। কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদকত্বকালেও কৈলাসচন্দ্র নিয়মিতরূপে Hindoo Patriotএ লিখিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে দিবসে দরিদ্রপ্রজাপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। কৈলাসচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের 'বেঙ্গলী'তে ও মধ্যে মধ্যে লিখিতেন এবং গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে 'বেঙ্গলীতে রীতিমত লিখিতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'বেঙ্গলী'তে গিরিশচন্দ্রের জীবনকথা-সম্বলিত মৃত্যু-বিষয়ক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা কৈলাস-চন্দ্রের রচনা। মৎপ্রকাশিত 'Life of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the 'Hindoo Patriot' and the 'Bengalee' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।



কালীপ্রসন্ন সিংহ

যেখানে জনহিতকর সভা সমিতির অধিবেশন হইত, সেইখানেই কৈলাসচন্দ্র উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতেন। সহপাঠী গিরিশচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেলুড় স্কুল এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং শিক্ষার উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমীদার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টায় উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। "দরিদ্রদিগকে শিক্ষা দান, অভাবগ্রস্তদিগকে সাহায্য প্রদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীকে ঔষধদান, দরিদ্র বিধবা ও অনাথদিগকে সাহায্যদান" প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠান এই সভার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। এই সভা এককালে নীরবে যে সকল মহৎকার্য্য সংসাধিত করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দে অভিভূত হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক কর্ণেল ম্যালিসন, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র, মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি

প্রসিদ্ধ জননায়কগণ এই সভায় বাৎসরিক অধিবেশনাদিতে উপস্থিত থাকিয়া ও বক্তৃতাদি করিয়া সভার উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে এপ্রিল দিবসে এই সভার এক বার্ষিক অধিবেশনে কৈলাসচন্দ্র Claims of the Poor বা 'দরিদ্রের দাবী' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে এই সভাদ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যের উপকারিতা প্রদর্শিত করিয়া তিনি দেশের লক্ষপতিদিগকে এই প্রতিষ্ঠানের পোষকতা করিতে আহ্বান করেন। দরিদ্র দেশবাসীকে শিক্ষাপ্রদানের আবশ্যকতা প্রদর্শিত করিয়া তিনি বলেন যে, শিক্ষার অভাবই আমাদের দেশের দুরবস্থার প্রধান কারণ, দরিদ্র প্রজাদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে যে জমীদারই লাভবান হইবেন তাহাও তিনি স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। তাঁহার সমগ্র বক্তৃতাটি উচ্চ নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি তাঁহার প্রতি বাক্যে পরিস্ফুট। এই বক্তৃতার উপসংহারে তিনি দেশের ধনী সন্তানগণকে অন্ধ খঞ্জ, বধির, প্রভৃতি দুর্ভাগাগ্রস্ত দরিদ্রের ক্লেশনিবারণের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা পাইতে অনুরোধ করেন।

বক্তৃতার সময় সভাস্থলে প্রসিদ্ধ বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও ওজস্বিনী

বক্তৃতায় কৈলাসচন্দ্রের মতের সমর্থন করিয়া তাঁহার বক্তৃতার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রাদিতে উহা উচ্চপ্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 'কলিকাতা রিভিউ'এর তাৎকালীন সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল ম্যালিসন উহার সুদীর্ঘ সমালোচনায় কৈলাসচন্দ্রের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। আমরা কর্ণেল ম্যালিসনের সমালোচনার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The author of this address is, if we mistake not, the able and indefatigable Secretary of the Bethune Society. To see him come forward in the noblest of all causes,—the cause of the poor,—is calculated to make those hope, who had begun to despair of the effect of education upon the natives of this great country,—for it is a striking proof of one, at least, of the tendencies which that education produces on the gentle nature of the Hindoo who may submit himself to its influence.

* * * *



কর্ণেল জি, বি, ম্যালিসন

We have ourselves read the lecture with the greatest pleasure. *It is admirable in style, and excellent in its moral tone.* Baboo Koylas has set an example which, we believe, his countrymen will imitate and has made an appeal to which, we fervently hope, they may respond."

রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিসভা। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৯ শে এপ্রিল দিবসে শ্রীবৃন্দাবন ধামে হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা, বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, কে, সি, এস, আই দেহত্যাগ করেন ইহাতে দেশে জাতিসাধারণ শোক উপস্থিত হয়। দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আহ্বানে ঐ বৎসর ১৪ই মে দিবসে এই স্বর্গগত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ এক বিরাট স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। মনীষী প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি, এস, আই মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু (পরে মহারাজা স্যর) রমানাথ ঠাকুর, বাবু (পরে রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মিষ্টার জন কক্রেন,



রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব

কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, মিষ্টার মন্টি্রউ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, রেভারেণ্ড মিষ্টার ডল্, রেভারেণ্ড মিষ্টার লঙ্, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র, অধ্যাপক লব্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর প্রস্তাব করেন যে রাজা স্যর রাধাকান্তের স্মরণার্থে তাঁহার একটি প্রস্তর ময়ী প্রতিমূর্ত্তি কোনও প্রকাশ্য স্থলে প্রতিষ্ঠিত হউক। দরিদ্রের বন্ধু কৈলাসচন্দ্র এই প্রস্তাবের পরিবর্ত্তে প্রস্তাব করেন যে, দরিদ্র বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য একটি সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়া দয়ার সাগর রাধাকান্তের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি :—

"সভাপতি মহাশয়,—এই মাত্র যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত ও সমর্থিত হইল, তদ্বিষয়ে সভার সম্মতি গ্রহণের পূর্ব্বে আমি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আপনার প্রশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি ও এই বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। মহাশয়, স্বর্গীয় রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিপূজার জন্য আহূত এই সভা, আমার মতে একটি গভীর অর্থ বহন করিতেছে তদ্বিষয়ে কোনও ভুল নাই। সকল বিষয়েই রাজা দেশীয় সমাজের নেতা ও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। যদিও তাঁহার মর্ত্ত্যজীবনের শেষ দিনগুলি তিনি আত্মীয়,

স্বজন ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর বৃন্দাবনের ছায়াস্নিগ্ধ পুষ্প-সুরভিত কুঞ্জমধ্যে ভগবচ্চিন্তায় অতবাহিত করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার অবস্থিতিতে যেরূপ, তাঁহার অনুপস্থিতিতেও সেইরূপ. তাঁহার নৈতিক প্রভাব আমাদের উপর অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইতেছিল। সমধর্ম্মী হউন বা বিধর্ম্মী হউন, উদারনৈতিক হউন বা রক্ষণশীল হউন, সকলেই তাঁহাকে সমভাবে সম্মান করিতেন। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কোনও পরিবার বা জাতির বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে রুচি, মত বা ধর্ম্মবিশ্বাসের বৈষম্য থাকিলেও যথার্থ মহত্ত্ব সেই বৈষম্য সত্ত্বেও সেই পরিবার বা বা জাতির উপর তাহার মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তারিত করিতে পারে। আমাদের সমাজের নব্য সংস্কারকগণ, যাঁহারা আমাদের সামাজিক আচারাদির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত অসংখ্য সামাজিক দোষগুলি দূর করিবার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত প্রয়াস পাইতেছেন—এমন কি রাজবিধি দ্বারাও বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা পাইতেছেন, যাঁহারা মুমূর্ষু পিতামাতাকে 'অন্তর্জলী' করিতে দিতে অসম্মত এবং শবদাহের পরিবর্ত্তে সমাধির পক্ষপাতী—সেই সকল নব্য সংস্কারক-গণের রুচি, অভিমত, ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত রাজা রাধাকান্ত দেবের রুচি, মত, ও ধর্ম্মবিশ্বাসের একতা ছিল না। তথাপি, মহাশয়, যদি আমি ভুল বুঝিয়া না থাকি, তবে যাঁহারা বিধবা-বিবাহ এবং অন্যান্য সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী, রাজা রাধাকান্ত আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহাদের মত ও কার্য্যের চিরবিরোধী ছিলেন, তাঁহারাই এই সভার প্রধান উদ্যোগী। সুতরাং আমরা যে সকলে এক-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিতে এই স্থলে

সমবেত হইয়াছি, ইহা কি একটি গভীরতম তাৎপর্য্যের সূচনা করিতেছে না? যখন কোনও ভিন্নমতাবলম্বী সংস্কারক আন্তরিকতার সহিত রক্ষণশীল বিরুদ্ধবাদীর পূজা করে তখন ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সকল প্রতিবিধায়িনী শক্তির অস্তিত্বসত্ত্বেও মহত্ত্ব সকল ধর্ম্ম ও সামাজিক মতদ্বৈধ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

মহাশয়, আমরা স্বর্গীয় মহাত্মাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতাম, কেবল তিনি সদ্বিদ্বান ছিলেন বলিয়া নহে কিম্বা তিনি শব্দকল্পদ্রুমের সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া নহে, তিনি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, কিম্বা তিনি সাধু ও মিষ্টভাষী ছিলেন বলিয়া নহে, কিন্তু তাঁহাতে হৃদয় ও মনের সেই সকল মহৎগুণের অধিষ্ঠান ছিল, যে সকল গুণ যে কোনও সময়ে যে কোনও জাতীয় ব্যক্তিকে মহত্ত্ব প্রদান করিতে পারে। যদি এ দেশের কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে তাঁহার স্বভাব রাজার ন্যায় উদার, যে তাঁহার প্রসন্ন আনন করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সতত উদ্ভাসিত, যে তাঁহার হৃদয় দেশপ্রেমে আলোকিত ছিল—তবে সে কথা ন্যায় ও সত্যের সহিত এই প্রবীণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারিত—যিনি সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার চিতাভস্ম পুণ্যসলিলা ভাগীরথী এখনও বহন করিতেছে এবং যাঁহার আত্মা চিরশান্তিময় রাজ্যে প্রয়াণ করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশে কেবলমাত্র প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলে চলিবে না।। কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহার বিষয় লোকে বিস্মৃত হইবে এবং অনাবৃত অবস্থায় উহা কোথাও পড়িয়া থাকিবে। তাঁহার দেশবাসী

ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তিনি যে অনন্যসাধারণ গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার সেই গুণ স্মরণ করাইয়া দেয় ইহাই বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, দানশীলতার জন্যই তিনি সমধিক বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা কোনও সৎকার্য্যে দানের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হইয়াছে উহার পরিবর্ত্তে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে দরিদ্র হিন্দুবিধবা ও অনাথদিগকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখা হউক।"

রাজা রাধাকান্তের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য যে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সংগঠিত হয়, কৈলাসচন্দ্র তাহার একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্যস্মৃতি কুমারী মেরী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে আগমন করেন। কলিকাতায় আসিলে একদিন প্রসঙ্গক্রমে রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্‌ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইংলণ্ডে যেরূপ একটি সমাজ-বিজ্ঞান সভা আছে, এদেশে সেইরূপ একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কি না? মেরী কার্পেণ্টার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ এবং কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালী জননায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৭ই ডিসেম্বর

দিবসে এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে একটি প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করেন। মহামান্য গবর্ণর জেনারেল, লেফটেনাণ্ট গবর্ণর এবং বহু সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হন। মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় এদেশে একটি সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "জন-সাধারণের সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগকে সন্মিলিত করিয়া বঙ্গদেশে সামাজিক উন্নতির সহায়তা করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল।" প্রথম বৎসর মাননীয় মিষ্টার জষ্টিস্ ফিয়ার (পরে স্যর জন্ বড্ ফিয়ার) এই সভার সভাপতি এবং মাননীয় মিষ্টার জষ্টিস্ নরম্যান ও বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সভার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মিষ্টার বিভার্লি ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র উহার সম্পাদক হন। কৈলাসচন্দ্র এই সভার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহার একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। এই সভা চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল; ব্যবস্থাশাস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্য। কৈলাসচন্দ্র স্বাস্থ্যশাখার অন্যতম প্রধান সভ্য হইলেও অন্যান্য শাখার প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি ছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে



মেরী কার্পেণ্টার

জুলাই দিবসে তিনি শেষোক্ত শাখায় 'হিন্দুদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা (Domestic Economy of the Hindus) শীর্ষক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। উহাতে তিনি মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণের গ্রন্থাদি হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিগণের পারস্পারিক সম্বন্ধ বিচার করেন, এবং বর্ত্তমান আচার ব্যবহারাদির দোষে আমাদের কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে বা হইতে পারে তাহা প্রদর্শিত করেন। সন্তানদিগের প্রতি মাতাপিতার অত্যধিক স্নেহ এবং তাঁহাদের বিলাসিতায় প্রশ্রয় দান, স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াও হিন্দুসন্তানগণ কর্ত্তৃক ভ্রান্ত মাতাপিতার আদেশ অনুপালন, একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ, বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়ায় আয়ের অনুপাতে অত্যধিক ব্যয় প্রভৃতি দোষে কিরূপে আমাদের সমাজ অবনতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকগণ নৃত্যগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা শিখিতেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে বিরাট রাজান্তঃপুরে অর্জ্জুন নৃত্যগীতাদিতে শিক্ষা দিতেন কিন্তু এক্ষণে হিন্দু পরিবারে এই সকল নির্দ্দোষ কলাবিদ্যাশিক্ষা দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হয়, এই জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পুনরায় হিন্দু স্ত্রীলোক-

গণকে এই সকল বিদ্যায় শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। কুমারী মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার Six months in India নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতার এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন।

রামগোপাল ঘোষের জীবনী।

হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ও সুলেখক মিষ্টার এস্, লব্, ছাত্রগণের তথা স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মানসিক উন্নতি বিধানকল্পে মধ্যে মধ্যে তাঁহার য়ুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুগণকে কলেজগৃহে নীতিগর্ভ উপদেশ ও বক্তৃতাদি প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহারই আমন্ত্রণে একবার 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ হুগলী কলেজে বাঙ্গালী ক্রোরপতি রামদুলাল দের জীবনকথা বিবৃত করেন। অধ্যাপক লব্ কৈলাসচন্দ্রকেও একটি বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী দিবসে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান নেতা,'ভারতবর্ষের ডিমস্থিনিস্', 'স্বদেশরক্ষার ভীম' রামগোপাল ঘোষ নামশেষ হন। রামগোপালের জীবনীতে শিক্ষনীয় অনেক কথা আছে এই জন্য কৈলাসচন্দ্র রামগোপাল ঘোষের জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত

করেন। দেশীয়দিগের অকৃত্রিম বন্ধু লব্‌ ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হন এবং কৈলাসচন্দ্রকে লিখেন :—

"I for one, am surfeited with Socrates, Milton, Bacon and such like stock subjects. It will be refreshing to hear the life and labors of one who is not a household word among us Europeans, to listen to the life of a real man who has benefited his countrymen by works of practical usefulness and by leaving behind him a good example, a noble ideal, which all may try to imitate if they cannot thoroughly realise."

কৈলাসচন্দ্র রামগোপালের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার চরিত-কথা রচনা করিয়া ১লা ফেব্রুয়ারি দিবসে হুগলী কলেজের গৃহে উহা বিবৃত করেন। কৈলাসচন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ গিরিশচন্দ্র এই বক্তৃতার উপসংহারাংশ লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাটী পরে রামগোপাল ঘোষের ছায়াচিত্রের সহিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাৎকালীন সাময়িক পত্রাদিতে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল।



রামগোপাল ঘোষ

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীত হয় যে এই পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ সমস্ত অর্থ কৈলাসচন্দ্র রামগোপালের স্মরণার্থ কার্য্যের আনুকূল্যে প্রদান করিয়াছিলেন ঃ—

"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মৃত বাবু রামগোপাল ঘোষের বান্ধবগণ তাঁহার স্মরণার্থ কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদাসীন নহেন। তাঁহারা সভা করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণে উদ্যত হইয়াছেন। আর একটি উদার অনুষ্ঠান দেখিয়া আমরা অধিকতর প্রীতিলাভ করিলাম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু হুগলী কলেজে রামগোপাল বাবুর জীবনবৃত্তান্ত লইয়া এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহা পুস্তকাকারে বদ্ধ হইয়া মুদ্রিত ও বিক্রীত হইতেছে। মূল্য একটাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। উহা বিক্রীত হইয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা রামগোপাল বাবুর স্মরণার্থ কার্য্যের আনুকূল্যার্থ প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা ঐ পুস্তক ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগের কেবল যে কৈলাসবাবুর বক্তৃতা পাঠ করিয়া এবং রামগোপাল বাবুর জীবন চরিতগত সবিস্তার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৌতূহল বিনোদিত হইবে এরূপ নয়, তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থদ্বারা স্মরণার্থ কার্য্যেরও সবিশেষ আনুকূল্য হইবে। এক প্রযত্নে এই উভয়বিধ ইষ্টলাভ সামান্য সুখাবহ নহে।"

সোম প্রকাশ, ১৩ই ফাল্গুন, সন ১২৭৪ সাল

রামগোপাল ঘোষের স্মৃতিসভা।

এই বৎসর ২২শে ফেব্রুয়ারী দিবসে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার গৃহে বাঙ্গালার দেশনায়কগণ রামগোপালের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক বিরাট স্মৃতিসভা আহ্বান করেন। এই সভায় বাবু (পরে মহারাজা স্যর) রমানাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবং ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বক্তৃতাদি করেন। কৈলাসচন্দ্র এই সভাতেও একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। আমরা উহার মর্ম্মানুবাদ পাঠকগণকে উপহার দিতেছি :—

"ভদ্র মহোদয়গণ, অধিক দিনের কথা নহে, এখনও এক বৎসর অতীত হইয়াছে কি না সন্দেহ, আমরা এই গৃহে একজনের স্মৃতি-পূজার জন্য সমবেত হইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সর্ব্ববাদিসম্মত নেতা ছিলেন। তাঁহার মহত্ত্ব, অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, শিশুসুলভ সরলতা, স্বভাবসিদ্ধ দয়া ও বদান্য ব্যবহার অপূর্ব্ব প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া—যে প্রতিভা অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শী জ্ঞানে পরিণতি লাভ করিয়াছিল সেই প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া—তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ের উপর তাঁহাকে এরূপ আধিপত্য প্রদান করিয়াছিল যে কি রক্ষণশীল কি উদারনীতিক, সকলেরই স্মৃতিপটে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে। স্বর্গীয় স্যর রাজা রাধাকান্ত একজন নিষ্ঠাবান

হিন্দু ছিলেন। তিনি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন এবং আমাদের পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক অত্যাচারিত নির্ব্বন্ধশীল এবং কুসংস্কারাপন্ন দেশবাসিগণের মধ্যে আমরা যে সকল সামাজিক সংস্কার সাধিত করিতে প্রয়াস পাইতেছি তিনি তাহার অনেকগুলিরই বিরোধী ছিলেন। তথাপি স্যর রাজা রাধাকান্ত তাঁহার ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধবাদিগণের নিকট হইতে অল্প সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হন নাই। আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম কারণ তিনি হৃদয়ের ও মনের সেই সকল গুণে ভূষিত ছিলেন, যে সকল গুণ দেশ ও কাল নির্ব্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকে। আজ আমরা আর একজনের স্মৃতিপূজার জন্য সমবেত হইয়াছি যিনি সম্প্রতি আত্মীয় ও প্রতিভামুগ্ধ জনসাধারণকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি রাজা রাধাকান্তের ঠিক প্রতিরূপ ছিলেন না, কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। রাজা রাধাকান্তকে যদি দেশীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা বলা যায় তবে রামগোপালকে তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে উদারনীতিক সম্প্রদায়ের ও শিক্ষিত সমাজের নেতা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আমাদের আজিকার কার্য্য অসঙ্গত ও উপযোগিতা-রহিত কিম্বা আমাদের কোনও পাত্রাপাত্র বিচার নাই এবং কোনও রূপে কেহ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেই তাঁহাদিগকে আমরা নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা আমাদের কার্য্যে কোনও অসামঞ্জস্য বা অবিবেকিতার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন না। কারণ, যে বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিতেছি, তাঁহাদের

ধর্ম্মমতে বিলক্ষণ বৈষম্য থাকিলেও তাঁহারা উভয়েই সেই সকল মহদ্‌-গুণে ভূষিত ছিলেন, যে সকল গুণ মানব চরিত্রের যথার্থ অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হয়—সাধুতা, অধ্যবসায়, বদান্যতা, দানশীলতা, ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রীতি, জনহিতৈষণা, পরোপকারের জন্য আত্মবিসর্জ্জনেচ্ছা। স্যর রাজা রাধাকান্ত ও বাবু রামগোপাল উভয়েই খুব অধিক মাত্রায় এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। আপনাদের অনেকেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে এই দুইজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াও ঈর্ষা বা ঘৃণার পরিবর্ত্তে পরস্পরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমি একটি ঘটনা জানি যাহাতে পরস্পরের এই শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে টাউন হলে চার্টার সভায় রামগোপাল তাঁহার সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহি অগ্নিময়ী বক্তৃতা শেষ করিয়া বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইলে, সেই সভার সভাপতি স্যর রাজা রাধাকান্ত তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রামগোপালকে তাঁহার সুললিত বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রেমভরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, ‘ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন, আপনি আপনার দেশের সেবায় আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হউন। আপনি আমাদের সমাজের মুখপাত্র, আপনি আমাদের জাতির অলঙ্কার স্বরূপ।’ রামগোপাল নম্রভাবে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, ‘আপনারা আমা হইতে যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আপনার মুখে শুনিয়া আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। কিন্তু মহাশয় আমি

যতদূর করিতে পারিব, দেশ আপনার নিকট হইতে তদপেক্ষা অধিকতর কল্যাণের আশা করে।'

"পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তারা অগ্রেই বলিয়াছিলেন যে, রামগোপাল জীবনে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্ম-গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি এতগুলি স্বভাবদত্ত গুণের অধিকারী ছিলেন যে তদ্দ্বারা তিনি তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকথা মুদ্রিত হইয়াছে এবং সাধারণের নিকট সহজলভ্য হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার দেশবাসীর সামাজিক, রাজনীতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির জন্য বিবিধ অনুষ্ঠানে তাঁহার অদ্ভুত পরিশ্রম—যে সকল কার্য্যের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় থাকিবেন এবং আমাদের উত্তর-পুরুষগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন—সে সকলের বিষয় বিস্তারিত ভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন।

রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুতে বঙ্গমাতা তাঁহার একজন অত্যুৎকৃষ্ট সন্তানকে হারাইলেন। অদম্য উৎসাহ, প্রশংসনীয় সাধুতা, অসীম আত্মনির্ভরতা, অবিচলিত অধ্যবসায়, অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও উদারতম হৃদয় তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র, স্নেহশীল পিতা, আন্তরিক ও অকপট বন্ধু এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে বোধ হয় এমন কোনও যোগ্য ব্যক্তি নাই যিনি তাঁহার পরিত্যক্ত আসন অধিকার করিয়া উহা অলঙ্কৃত করিতে পারেন।"

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর পরিচালক সমিতি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কৈলাসচন্দ্রের অসীম আগ্রহ ছিল এবং বহু বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে তিনি সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশাদি দিয়া এবং ছাত্রগণকে উৎসাহবাক্যাদি দ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়া নীরবে শিক্ষার উন্নতি সংসাধিত করিতেন। তাঁহার শিক্ষাস্থল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর উন্নতির প্রতি চিরদিন তাঁহার দৃষ্টি ছিল। মধ্যে কিছু অবনতি হওয়ায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে উন্নতির জন্য উহার পরিচালনভার একটি সমিতির উপর ন্যস্ত হয়। বেঙ্গলী-সম্পাদক গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার মধ্যম অগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ, যদুলাল মল্লিক, কৈলাসচন্দ্র বসু, 'বেঙ্গলী'র ম্যানেজার বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ডব্লিউ সি, বনার্জী (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) এই সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য সমিতির সদস্যগণ সকলেই ওরিয়েণ্ট্যাল সেমি-নারীতেই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৈলাসচন্দ্র মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সমিতিতে থাকিয়া এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিসভা।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র একটি ভীষণ শোকের আঘাত প্রাপ্ত হন। এই বৎসর ২০শে সেপ্টেম্বর দিবসে তাঁহার শৈশবের বন্ধু সতীর্থ ও সহচর, সাহিত্যসেবার সঙ্গী, অত্যাচারীর চিরশত্রু, অত্যাচারিতের চির সহায়, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বদেশ-প্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৪০ বৎসর বয়সে জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই দারুণ দুর্ঘটনায় দেশব্যাপী শোক উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু কৈলাসচন্দ্রের হৃদয় যে কিরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। 'বেঙ্গলী'তে তিনি গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐ বৎসর ১৬ নভেম্বর দিবসে বাঙ্গালার জননায়কগণ গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য একটি বিরাট স্মৃতিসভা আহ্বান করেন। শোভাবাজারের সুবিদ্বান রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই শোকসভায় যোগদান করেন। রাজা (পরে মহারাজা) সার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কৈলাসচন্দ্র বসু, অধ্যাপক এস্



গিরিশচন্দ্র ঘোষ (পরিণত বয়সে)

লব, মৌলবী (পরে নবাব) আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ পত্রের প্রথম সম্পাদক মিষ্টার জেম্‌স্‌ উইলসন, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। এই সভায় কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতাটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। সকল সংবাদপত্রে এই বক্তৃতাটী প্রশংসিত হইয়াছিল। আমরা এই বক্তৃতাটিরও * মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি—

"রাজা কালীকৃষ্ণ এবং ভদ্র মহোদয়গণ

যে মহৎ বিষয়ের আলোচনার জন্য আমরা এই স্থানে সমবেত হইয়াছি তাহার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, আমি সে আলোচনায় যথাযথভাবে যোগদান করিতে পারিব কি না আমার মনে এই আশঙ্কা উদিত হইতেছে। কারণ, প্রথমতঃ, যে পরলোকগত মহাত্মার সদ্‌গুণাবলী আজ আমরা কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিতেছি তিনি আমার একজন প্রিয়তম ও স্নেহময় বন্ধু ছিলেন। শৈশবে আমাদের বন্ধুত্বের সূচনা হয় এবং তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন তাঁহার বিবিধ অসাধারণ গুণগুলি

---

* মূল ইংরাজী বক্তৃতাটি মৎপ্রকাশিত "Life of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee" নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

সাধারণ কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত হইতেছে ইহাতে আমার মনে সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে শোকবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে কারণ যে দুঃখময় ঘটনার বিষয় বিস্মৃত হইয়া আমি মানসিক শান্তির অন্বেষণ করিতেছি উহা সেই দুর্ঘটনার কঠোর সত্যতা আমাকে স্মরণ করাইয়া নিরন্তর শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। কিন্তু যিনি বন্ধুদের গর্ব্বের বিষয় এবং দেশের গৌরব স্থানীয় ছিলেন তাঁহার জন্য শোক ও সহানুভূতি প্রকাশের জন্য আহূত এই বিরাট সভায় মানসিক শান্তিলাভের প্রয়াস বৃথা। এই ভীষণ ঘটনায় আমি একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি এবং আমার মুখ হইতে বাক্যনিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমাকে পালন করিতেই হইবে এবং অতি ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণ ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলেও আমি আপনাদের নিকট কয়েক মুহূর্ত্তের সময় ভিক্ষা করিতেছি। মহাশয়, এই সভায় উচ্চতম উপাধিভূষিত রাজা মহারাজা হইতে আফিসের নিম্নতম পদস্থ কেরাণী পর্য্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছেন ইহাতে যে নিগূঢ় ভাবের সূচনা করিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করা অসম্ভব। ইহাতে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে যে পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দুসমাজ এখন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, জাতীয় অভিমান, ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব ও বংশাভিমান দ্বারা কলুষিত নহে, এক সৌভ্রাত্রবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি স্নেহ ও প্রীতিভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইহা আনন্দের বিষয় যে আভিজাত্যগর্ব্ব আজ এতদূর হ্রাস পাইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান সময়ের একটি আশা ও আনন্দদায়ক লক্ষণ। যে শিক্ষা দেশের

ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বিনষ্ট করিয়া দেয় ইহা নিঃসন্দেহ সেই শিক্ষার ফল। সুতরাং আমি পুনরায় বলি, এই সভা দেশের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির পরিচায়ক। যিনি ঐশ্বর্য্যে বা পদগৌরবে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র ছিলেন না, অথচ যিনি তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ একজন সাধারণ ব্যক্তির স্মৃতিসভায় যে সকল রাজা জমীদার ও ক্রোরপতিউ পস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা গণনা করিলেই আমাদের দেশ যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা নিজেরাই সম্মানিত হইয়াছেন।

আমার পূর্ব্বেই যে মাননীয় রাজা বাহাদুর বক্তৃতা করিলেন তিনি যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং যে প্রস্তাবটি আমি সমর্থন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি সেই প্রস্তাবে আমার পরলোকগত বন্ধুর চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে তিনি অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতি, প্রশংসনীয় পুরুষকার, ও পবিত্র চরিত্রের সহিত সদয়, স্নেহময় এবং সরল ও অকপট স্বভাব, প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁহার প্রবন্ধে ও বক্তৃতাদিতে সেই সকল গুণগুলি অতি উজ্জ্বলভাবে পরিদৃশ্যমান। কিন্তু এই প্রস্তাবে একটি বাক্যপ্রয়োগ করা হইয়াছে যাহাতে সর্ব্বোপরি বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের চরিত্রের যথার্থ ও প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়। যিনি একদিনের জন্যও বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষের সহিত পরিচিত হইয়াছেন তিনিই আনন্দের সহিত স্বীকার করিবেন যে তিনি সরল ও অকপট স্বভাব ব্যক্তি

ছিলেন। আজ কালিকার দিনে—বাহিরের চাকচিক্য ও কপট আড়ম্বরপূর্ণ শিষ্টাচার প্রদর্শনের দিনে সেরূপ ব্যক্তির দর্শন পাওয়া যায় না। আন্তরিকতা বাবু গিরিশচন্দ্রের কোমল হৃদয়ের চিরসঙ্গী ছিল এবং যাহা তাঁহার হৃদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইত বা যাহাতে পরে অনুতাপ আসিতে পারে এরূপ কার্য্য তিনি কখনও করেন নাই। তিনি অনেক সাংসারিক বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, অনেক পারিবারিক দুর্ঘটনায় ব্যথা পাইয়াছিলেন, বাধ্য হইয়া মামলা মোকদ্দমায় অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া দারিদ্র্যে পতিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার চরিত্র চিরদিন সাধু ও সারল্যমণ্ডিত ছিল। তাঁহার নৈতিক চরিত্র সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ স্থানীয় ছিল। তিনি ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন এবং সেই জন্য দরিদ্রপালনে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইত। যদিও তিনি স্বয়ং দরিদ্র ছিলেন তথাপি তাঁহার সেই স্বল্প আয় অভাবগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সহিত ভাগ করিয়া লইতেন। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে বেলুড়ের অনেক বিধবা ও অনাথ বালকবালিকা তাঁহার সাহায্যে প্রাণ ধারণ করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় এবং তাঁহারই মুক্তহস্ত দানে তাঁহার বন্ধু ও সহযোগী স্বর্গীয় হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বসতবাটি নীলাম হইতে রক্ষা পায়। তিনি দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং চিরদিন দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া স্মরণীয় থাকিবেন। গত মহাঝটিকায় বেলুড় এবং তৎসন্নিহিত গ্রাম সমূহের সর্ব্বনাশ হয়। সেই সময় তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্বয়ং পদব্রজে গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া সাহায্য ভাণ্ডার হইতে এবং স্বীয় ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া গ্রামবাসীর অভাব মোচন করিয়াছিলেন।

যাঁহাদের সহিত তিনি সংস্রবে আসিতেন তাঁহাদের সকলের প্রতি শিষ্ট ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। তাঁহার জীবনে তিনি কখনও কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণ করেন নাই। এরূপ রূঢ় ব্যবহার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পক্ষান্তরে অপরিচিতকে মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিচিত এবং পরিচিতকে মুহূর্ত্তমধ্যে বন্ধুরূপে পরিণত করিবার তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। পরিচিত বা অপরিচিত যে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতেন তিনিই তাঁহার নিকট সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু দরিদ্র ও নিরাশ্রয়ের প্রতিই তাহার গভীরতম সহানুভূতি ছিল এবং প্রজাপক্ষ সমর্থনই তাহার জীবনের ব্রত ছিল। প্রজাপক্ষ সমর্থন বিষয়ে তাহার যথার্থ অভিপ্রায় কেহ কেহ সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন (যদিও এরূপ অনুমানের কোনও ভিত্তি নাই) যে তিনি জমিদারদিগের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এতদ্দেশীয় শাসনপ্রণালীর একটি মহদ্দোষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এরূপ অনুমান নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবল গবর্ণমেণ্ট এবং জমিদারগণের মধ্যেই বর্ত্তমান বলিয়াই তিনি ইহার নিন্দা করিতেন। তিনি বলিতেন যে যথার্থ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহাকেই বলা যায় যাহাতে প্রজা তাহাদের জমীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব লাভ করিতে পারে। রাজবিধি জমিদারের হস্তে প্রজাপীড়ন, করবৃদ্ধি এবং প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এবং অনেক অশিক্ষিত, স্বার্থপর এবং উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি জমিদার সর্ব্বদা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান

সর্ব্বতোমুখী উন্নতির দিনে এরূপ জমিদার অতি বিরল এবং যেমন একদিকে বাবু গিরিশচন্দ্র এইরূপ নীচাশয় জমীদারদিগকে তাঁহার শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে তীব্র কশাঘাত করিয়া লোক সমক্ষে তাহাদের কলঙ্ককাহিনী প্রকাশিত করিতেন অপরপক্ষে তিনি দেশের গৌরবস্থল, আদর্শ জমীদারবর্গ, যাঁহারা প্রজাগণকে নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায় আদর করেন এবং পিতার ন্যায় তাহাদের উন্নতির প্রতি স্নেহশীল দৃষ্টি রাখেন, তাহাদের গুণকীর্ত্তন করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিতেন। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বয়ং একজন আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা এবং ধর্ম্মজ্ঞানের এরূপ সামঞ্জস্য ছিল যে তাঁহার কার্য্যে কোনও প্রকার অসংযম বা কপটতার চিহ্ন দেখা যাইতনা। তিনি প্রখর কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন কিন্তু এই শক্তি সর্ব্বদাই বিবেক দ্বারা সংযত হওয়ায় তিনি তাহার শক্তিশালী লেখনী অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি পরের দুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করিতেন সেই জন্য তাঁহার ভাষাও অতিশয় ওজস্বিনী ছিল। কিন্তু তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে বিদ্বেষের লেশ থাকিত না। কোনও ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ বা ঈর্ষার ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি আততায়ীকে বিদ্রূপবাণ বর্ষণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন কিন্তু তাঁহার এই ক্ষমতা তিনি অভ্যাসদ্বারা অর্জ্জন করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল না। অসংখ্য ইংরাজী উপন্যাস ও সমসাময়িক সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে তিনি এই শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাপদ্ধতিতে এমন একটী মনোহারিত্ব, লালিত্য ও ওজস্বিতা ছিল

যে অন্যান্য দেশীয় লেখকগণের ইংরাজী রচনা হইতে তাঁহার রচনা অনায়াসেই পৃথক করা যাইতে পারে। হিন্দু পেট্রিয়ট, রেকর্ডার এবং বেঙ্গলীর স্তম্ভে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন, গিরিশবাবুর লিখিত প্রবন্ধগুলি যেন তাঁহার নামাঙ্কিত বলিয়া প্রতিভাত হইবে। সেগুলি এরূপ বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত যে দেশীয় কোনও লেখকের রচনা তাহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কিন্তু মৌলিকতার জন্যই তাঁহার রচনাগুলি বিশেষরূপে আদৃত হইত। তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন এবং তাঁহার রচনাগুলি অতুলনীয় ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। আমাদের মধ্যে এখন অনেক নবীন ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগকে তিনি নিজ রচনাপদ্ধতিতে শিক্ষা-দান করিয়াছিলেন। ইঁহারা এক্ষণে ইঁহাদের প্রতিভাশালী গুরুর সমকক্ষ হইবার আশায় তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত আছেন। বাস্তবিক তিনি অনেককেই বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার শেষজীবন তিনি বেলুড় নামক ক্ষুদ্র গ্রামের—যেখানে তিনি ইদানীং বাস করিতেছিলেন—সেই গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে বেলুড়ের বিদ্যালয় সামান্য পাঠশালা হইতে একটী প্রথম শ্রেণীর এন্‌ট্রান্স স্কুলে পরিণত হইয়াছিল। তিনি যখন হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন তখন তাঁহারই উদ্যোগে বেলুড়ের স্বল্পপরিসর গ্রাম্যপথগুলি প্রশস্ত রাজবর্ত্মে পরিণত হইয়াছিল। যেখানে স্যার রিচার্ড টেম্পল, ডাক্তার মৌয়েট প্রভৃতি মনীষিগণ সুললিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন, সেই হাওড়া ইনষ্টিটিউট তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত হইয়া-

ছিল। এবং তাঁহার মৃত্যুতে এই সভা একজন উপযুক্ত ও কৃতবিদ্য সভাপতি হারাইল।

অতএব যে দিক হইতে দেখি, তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা কিছুতেই পূরণ হইবার নহে। একজন সাধু, ধর্ম্মপ্রাণ, উদার দেশহিতৈষী, শান্তস্বভাব, অকপটহৃদয়, পরদুঃখ কাতর, সৎসাহসসম্পন্ন, তীক্ষ্ণপ্রতিভাশালী, ভাবুক, সুলেখক ও স্বাধীনচেতা কর্ম্মবীর দেশ হইতে অপসৃত হইলেন। দেশের কল্যাণের জন্য দেশের সেবা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার অকালমৃত্যু জাতীয় দুর্ভাগ্যের বিষয়। বর্ত্তমান মনের অবস্থায় আমার পক্ষে আর কিছু বলা অসম্ভব। ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে একজন কবি আমার বর্ত্তমান মনের অবস্থা আমার প্রাণের ভাষায় পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ;

চিরপ্রিয় বন্ধু মোর। প্রীতির আধার।
নিষ্ফল এ অশ্রুবৃষ্টি চিতায় তোমার!
মৃত্যুযন্ত্রণায় যবে করিল অস্থির,
প্রাণবায়ু ঘনশ্বাসে হইল বাহির,
প্রতিশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে ফেলিলাম কত,
কি ফল হইল তাহে? সর্ব্বআশা হত।
ক্রন্দনে যমের গতি রোধিবারে নারে।
দীর্ঘশ্বাসে মৃত্যুবাণ কে ফিরাতে পারে?
নবীন বয়স কিম্বা রূপগুণ হেরে
তিলেক বিলম্ব যম কভু কি গো করে?

তাহা যদি হত তবে এখনো নিশ্চয়
রহিতে জুড়াতে মোর তপ্ত আঁখিদ্বয় ;
গরবে হরষে তব বন্ধুর হৃদয়
উচ্ছ্বসিত হত লভি তোমার প্রণয়।
ধীর শান্ত আত্মা তব বদ্ধ মায়াপাশে,
এখনো বিলম্বে যদি চিতাভস্ম পাশে,
দেখ লেখা এ অন্তরে কি শোকের ছবি,
প্রকাশিতে নারে তাহা শিল্পী কিম্বা কবি।"

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়, কৈলাসচন্দ্র তাহার অন্যতম সম্পাদক হন। তাঁহার চেষ্টায় এই স্মৃতিসমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থ দ্বারা গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাস্থান ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে একটি ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

পরলোক গমন। চরিত্র। কৈলাসচন্দ্রের স্বাস্থ্য বরাবর অটুট ছিল। তিনি দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, কিন্তু ছুটী লন নাই। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে এবং তিনি তিন মাস ছুটী লইতে বাধ্য হন। এই বৎসর ১৮ই আগষ্ট দিবসে বৃদ্ধা জননী, শোকাকুলা সহধর্ম্মিণী ও অসংখ্য আত্মীয়

ও বন্ধুগণকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কৈলাসচন্দ্র ৫১ বৎসর বয়সে অকালে পরলোকগমন করেন।

কৈলাসচন্দ্র দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী, উদারচরিত্র, বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। কৈলাস চন্দ্রের জননীও যেরূপ বুদ্ধিমতী সেইরূপ করুণহৃদয়া রমণী ছিলেন। জননীর আদেশ কৈলাসচন্দ্রের নিকট বেদবাক্য ছিল। আমরা একটি ঘটনার কথা শুনিয়াছি তাহাতে একদিকে যেমন কৈলাসচন্দ্রের মাতৃভক্তির পরিচয়, অপর দিকে তেমনই তাঁহার জননীর উচ্চহৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে ঘটনাটি এই। সহকারী কণ্ট্রোলার জেনারেলের পদে উন্নীত হইবার পর একদিন কৈলাসচন্দ্রের জননী তাঁহাকে বলিলেন, "কৈলাস, এবার তুমি প্রথম যে মাইনে পাবে তাহা আমাকে দিতে হইবে।" পরে ঐ পদের প্রথম বেতন পাইলে কৈলাসচন্দ্র গাড়ী হইতে অবতরণ না করিয়া জননীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মা আজ মাইনে পাইয়াছি, টাকা কিসে লইবে?"

জননী বলিলেন, "এই আঁচলে দাও।" তিনি তৎক্ষণাৎ ৮০০৲ টাকা তাঁহার আঁচলে ঢালিয়া দিলেন। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত টাকা পাড়ার গরীব দুঃখীদের ডাকিয়া

বিতরণ করিয়া বলিলেন, "আমার ছেলের মাহিনা বাড়িয়াছে তোমরা আশীর্ব্বাদ কর।"

তদানীন্তন প্রথানুসারে বাল্যকালেই কলিকাতা (শ্যামবাজার) নিবাসী (ছাপরার প্রসিদ্ধ উকীল) পরলোকগত যদুনাথ মিত্র মহাশয়ের ভগিনীর সহিত কৈলাসচন্দ্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার সহোদর যদুনাথ বসু মহাশয়ের পুত্রদেরই তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। আর একজন বালক কৈলাসচন্দ্রের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাত নন্দলাল বসুর দৌহিত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিনবিহারী এবং ভাগিনেয় নরেন্দ্রনাথ দত্ত ভবিষ্যতে যশস্বী হইবেন দূরদর্শী কৈলাসচন্দ্র এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ "বিবেকানন্দ" নাম গ্রহণ করিয়া জগতের ইতিহাসে তাঁহার উচ্চহৃদয়ের ও গভীর জ্ঞানের নিদর্শন রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। বিপিনবিহারী ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে কার্য্য করিতেন এবং ইংরাজীতেও কৃতবিদ্য ছিলেন কিন্তু জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

কৈলাসচন্দ্র বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অনেক

দরিদ্রসন্তানকে অন্নদান এবং বিদ্যালয়ের বেতন ও পুস্তকাদি প্রদান করিতেন। একজন দরিদ্রসন্তান তাঁহারই সাহায্যে বি-এ পাশ করিয়া, তাঁহাকে বলেন, "আমি আপনারই কৃপায় কৃতবিদ্য ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছি, এক্ষণে আপনার কোনও উপকার করিতে পারি?" তদুত্তরে তিনি বলেন, "তুমি নিজে যেমন কৃতবিদ্য হইয়াছ সেইরূপ চারিটি দরিদ্র সন্তান যাহাতে তোমার মত কৃতবিদ্য হয় তাহাই কর।" বলা বাহুল্য, সেই কৃতবিদ্য ব্যক্তি কোনও কলেজের অধ্যাপক হইয়া তিন চারিজন দরিদ্রসন্তানকে আপনার বাটীতে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। সদ্‌গুণ সর্ব্বত্রই সদ্‌গুণের উত্তেজক।

কৈলাসচন্দ্র ইংরাজীতে সুলেখক ও বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি মধুর ও হৃদয়-গ্রাহী বলিয়া সর্ব্বজনপ্রশংসিত হইত। সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতি-বিশারদ, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন, "In the early years of his life, he (Koylas Chandra) acquired the deserving reputation of being one of the sweetest and most fluent public speakers of the time" কৈলাসচন্দ্র ইংরাজীতে একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত

হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না।

কৈলাসচন্দ্র অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কিন্তু স্বজাতির উন্নতির জন্য তিনি অন্ধভাবে দেশাচারের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের তিনি একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি সকল বিষয়ে দেশের ও সমাজের গৌরবের বিষয়। তাঁহার স্মৃতি দেশবাসীর শ্রদ্ধার সহিত পূজনীয়। আজ, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে এই অক্ষম লেখনী তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে লেখকের গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধার এই সামান্য অর্ঘ্য প্রদানের অবসর পাইয়া ধন্য হইল।



রমাপ্রসাদ রায়

(মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতির অনুমতিক্রমে 'মহতাব মঞ্জিলে' রক্ষিত তৈলচিত্র হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে)

নীরবকর্ম্মী রমাপ্রসাদ রায়

উপক্রমণিকা। মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণজালে যখন ভূমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে, উজ্জ্বলতম নক্ষত্রও তখন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। আমাদের জাতীয় জীবনের যে যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি পিতা রামমোহনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, সেই যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পুত্র রমাপ্রসাদের প্রতিভার আলোকরশ্মি যে ম্লানভাবে প্রতিভাত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। নতুবা যে অসাধারণ বাঙ্গালী তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অপূর্ব্ব-মনীষা ও অপ্রতিরুদ্ধ অধ্যবসায়ের বলে, অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথমে দেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালীর যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে দেশবাসীর জন্য বিচারপতির পবিত্র সিংহাসন অধিকৃত করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনকথা, তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী, আজ বাঙ্গালীর নিকট বোধ হয় অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইত না; মানব-স্বভাব-সুলভ সহস্র দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও মনীষী রমাপ্রসাদ রায়

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বোধ হয় আমাদের সাহিত্যরথি-গণের নিকট হইতে সসম্মান পূজা ও শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতেন না।

জন্ম। ১২২৪ বঙ্গাব্দে ১২ই শ্রাবণ (ইংরাজী ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে, রমাপ্রসাদ রায় জন্মপরিগ্রহ করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রের বংশপরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। আটবৎসর বয়ঃক্রমকালে বালক রামমোহনের প্রথমা স্ত্রীর দেহান্তর ঘটে। পরবৎসর তিনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কুড়মন পলাশি গ্রামে শ্রীমতী দেবী নাম্নী একটী বালিকাকে বিবাহ করেন এবং তাহার জীবদ্দশাতেই ভবানীপুরে কৃতনিবাস ৺মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী উমাদেবীকে বিবাহ করেন। মধ্যমা স্ত্রীর গর্ভে প্রথমে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন এবং রাধাপ্রসাদের জন্মের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে, কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হয়। উমাদেবীর কোনও সন্তানাদি হয় নাই।

জন্মস্থান। রমাপ্রসাদের জন্মস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কিশোরীচাঁদ মিত্র একস্থানে লিখিয়াছেন যে, ক্ষীরপাই রাধানগরে রমাপ্রসাদের জন্ম হয়।



রাজা রামমোহন রায়

কৃষ্ণদাস পাল-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে উহার প্রতিবাদ করিয়া একজন লেখক লিখিয়াছিলেন, খানাকুল কৃষ্ণনগরে রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বোধ হয় রামমোহন রায়ের চরিতকার ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সত্য। নগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন —"বিধর্ম্মী" বলিয়া "রামমোহন রায় পুত্র রাধাপ্রসাদ ও পুত্রবধূর সহিত মাতা (তারিণী দেবী ওরফে ফুল ঠাকুরাণী) কর্ত্তৃক পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুর গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করেন। উক্ত বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।"

মহাপ্রাণ পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে বালক রমাপ্রসাদের চিত্তবৃত্তি প্রথম বিকশিত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রামমোহন ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর দিবসে ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। রামমোহনের ইংলণ্ডগমনকালে রমাপ্রসাদ বালক মাত্র ছিলেন, তথাপি তাঁহার স্মৃতিশক্ত এত প্রখর ছিল যে তাঁহার পিতার স্নেহশীল ব্যবহারের আনন্দময়ী স্মৃতি তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়পটে চিরদিন সমুজ্জ্বল ছিল, এবং তিনি গৌরব-বিমিশ্রিত আনন্দের সহিত তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট উত্তরকালে তাঁহার পিতার কথা বলিতেন।

শিক্ষা। রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে বালক রমাপ্রসাদ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং রামমোহনের বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড উইলিয়ম আড্যাম উহার পরিদর্শক ছিলেন। ইংলণ্ড গমনকালে রামমোহন রমাপ্রসাদকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ ও অকৃত্রিম সুহৃদ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। এই সময়ে রমাপ্রসাদ 'পেরেণ্ট্যাল অ্যাক্যাডেমি'তে প্রবিষ্ট হন। চিরস্মরণীয় য়ুরেশিয়ান কবি, দার্শনিক ও শিক্ষক হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রিয়বন্ধু মিষ্টার রিকেট্‌স্ এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই বিদ্যালয় এক্ষণে ডভ্‌টন্ কলেজ নামে পরিচিত। রমাপ্রসাদ কিছুকাল পরে রামমোহন রায় ও ডেবিড্ হেয়ারের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবেশলাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁহার প্রতিভা বিশিষ্টভাবে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার গভীর পাঠানুরাগ, অবিচলিত অধ্যবসায়, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সহপাঠিগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম অভিভাবক প্রিন্স দ্বারকানাথের সহবাসে তিনি যথেষ্ট

মানসিক উন্নতি সংসাধিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ একস্থানে লিখিয়াছেন—"দ্বারকানাথ ঠাকুরের সবিশেষ সংসর্গ হওয়াতে অতি অল্প বয়সে তাঁহার মনুষ্য পরীক্ষা করিবার ও সহজে দুরবগাহ বিষয় সকল বুঝিয়া লইবার সবিশেষ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।" বাস্তবিক, রমাপ্রসাদের বাল্যজীবনের উপর দ্বারকানাথ যে অপরিমেয় মঙ্গলময় প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহাই যে রমাপ্রসাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ডেভিড হেয়ার স্মৃতি-সমিতি। হিন্দু-কলেজে পাঠাবস্থায় রমাপ্রসাদ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ডেবিড্ হেয়ারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। রামমোহন রায়ের পুত্রকে ডেভিড্ হেয়ার পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। রমাপ্রসাদও মহাত্মা ডেভিড হেয়ারকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন দিবসে হেয়ার সাহেব পরলোক গমন করিলে উক্ত বৎসর ১৭ই জুন তারিখে কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে



প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

মেডিক্যাল কলেজের গৃহে একটি বিরাট সভা আহূত করেন। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র, কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তারা হেয়ারের গুণকীর্ত্তন করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অবশেষে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসমিতি সংগঠিত হয়। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং এই স্মৃতিসমিতির অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। * এই সমিতির চেষ্টায় ডে[illegible] [illegible]য়ারের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হয় [illegible] প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সম্মুখে, পরে প্রেসিডেন্সী [illegible] ও হেয়ার স্কুলের মধ্যস্থিত ভূমিতে স্থাপিত হয়।

* অন্যান্য সদস্যের নামও এস্থলে উল্লেখযো[illegible] [illegible]জা কৃষ্ণনাথ রায়, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল সিংহ হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বৈকুণ্ঠ নাথ রায় চৌধুরী, রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী দিগম্বর মিত্র, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র দীননাথ দত্ত, ব্রজনাথ ধর, প্যারীচাঁদ মিত্র। হরচন্দ্র ঘোষ এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন।



ডেভিড্ হেয়ার
ও তাঁহার দুইজন ছাত্র

রামমোহনের অর্থাভাব। দিল্লীর বাদশাহের কার্য্যানুরোধে ইংলণ্ড গমনকালে রামমোহন বাদশাহ প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে সুদূর প্রবাসে যে তিনি অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন একথা বোধ হয় অনেকের নিকটেই এক্ষণে অপরিজ্ঞাত। স্বর্গীয় প্যারিচাঁদ মিত্র প্রণীত রামকমল সেনের জীবনীতে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসনের কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে ডাক্তার উইলসন দেওয়ান রামকমল সেনকে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহা হইতে পাঠকগণ রামমোহনের তাৎকালীন আর্থিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।—

"পূর্ব্বে লিখিত একখানি পত্রে আপনাকে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর কথা লিখিয়াছি। তাহার পর মিষ্টার হেয়ারের ভ্রাতার সহিত আমার সাক্ষাৎ ও উক্ত বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হয়। রামমোহন মস্তিষ্কের রোগে প্রাণত্যাগ করেন; তিনি খুব পুষ্টাঙ্গ হইয়াছিলেন এবং যখন আমি তাহাকে দেখি তিনি স্থূলকায় হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বদনমণ্ডল অত্যধিক শোণিতপ্রবাহে রক্তিমাভ

হইয়াছিল। তাঁহার যকৃত রোগ হইয়াছে এইরূপ সকলে অনুমান করিয়াছিলেন এবং তেনি সেই রোগের জন্যই চিকিৎসিত হইয়াছিলেন—মস্তিষ্কের রোগের জন্য নহে। মানসিক উদ্বেগে তাঁহার [illegible] ক্ষি পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অর্থাভাব বশতঃ সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন এবং অত্রত্য বন্ধুগণের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঋণগ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই তাঁহাকে যথেষ্ট ক্লেশস্বীকার করিতে হইয়াছিল, কারণ ইংলণ্ডের লোকেরা বরঞ্চ প্রাণ দিতে পারে তথাপি অর্থ হস্তান্তরিত করিতে চাহে না। অধিকন্তু, মিষ্টার স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট (যাঁহাকে তিনি তাঁহার সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন) তাঁহাকে বাকী বেতন বলিয়া অনেক টাকার দাবী লইয়া অত্যন্ত উত্যক্ত করিতেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ভয় দেখাইতেন যে যদি তিনি সমস্ত না দেন তাহা হইলে তিনি ইংলণ্ডে প্রকাশিত রামমোহনের পুস্তকাদি তাঁহার (স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণটের) স্বরচিত বলিয়া প্রকাশ করিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি যথার্থই তাহা করিয়াছেন।"

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে মৃত্যুকালে রামমোহন রায় প্রায় তিন লক্ষ টাকা ঋণ রাখিয়া যান।

রমাপ্রসাদের চাকুরী গ্রহণ।

রামমোহনের মৃত্যুর পর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সমস্ত ভার রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদের উপরেই পড়িল। রমাপ্রসাদ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া

সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা এবং জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অগ্রজের সহিত পৈত্রিক জমিদারী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি জীবিকা-অর্জ্জনের অন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের চিরস্মরণীয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক একটি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। রমাপ্রসাদ ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে নদীয়ার ডেপুটী হন এবং পরে ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধমান, হুগলী ও চব্বিশ পরগণায় কার্য্য করেন। বাঙ্গালা প্রদেশে তৎকালে এই চারিটী জিলাই কি ঐশ্বর্য্যে, কি বিদ্যাগৌরবে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই সকল জিলায় কার্য্য করিয়া রমাপ্রসাদ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। জর্জ্জ টয়েন্‌বির "A Sketch of the Administration of the Hooghly District from 1795 to 1845" নামক গ্রন্থপাঠে প্রতীত হয় যে রমাপ্রসাদ কিছুকাল হুগলী জিলায় কালেক্টরের কাও করিয়া-ছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালী এইরূপ দায়িত্ব

পূর্ণ কার্য্য করিবার অধিকার পান নাই। মিষ্টার টয়েনবি লিখিয়াছেন,—"The first Deputy Collector was Babu Kumapersad Roy, and I find that in 1842 he was in charge of the district during the Collector's illness—the first instance, probably, of a native Deputy Collector being in such charge." বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। এখনও বর্দ্ধমান রাজবাটীতে সযত্নরক্ষিত রমাপ্রসাদের সুন্দর তৈলচিত্র তাঁহাদিগের গভীর বন্ধুপ্রেমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেকালের ডেপুটী কলেক্টরদিগের পদ যথেষ্ট সম্মানের ছিল। এই পদের গৌরবরক্ষার জন্য দেশীয় ডেপুটী কলেক্টরগণকে সিবিলিয়ান কলেক্টরদিগের ন্যায় জাঁকজমকে থাকিতে হইত। সুতরাং যাঁহারা প্রভূত পৈত্রিক ধনের অধিকারী না হইতেন এবং অসাধুবৃত্তি অবলম্বন না করিতেন, তাঁহারা এই পদ প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট সম্মান লাভ করিতেন বটে কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন না। 'প্রিন্স' দ্বারকানাথের সহবাসে রমাপ্রসাদের রুচি অতি উচ্চ আদর্শে সংগঠিত হইয়াছিল। একজন অশীতিপর বৃদ্ধের

মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার 'আমীরি চাল' ছিল। যতই অধিক মূল্য হউক না কেন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্যাদিই ক্রয় করিতেন ও ব্যবহার করিতেন। রমা প্রসাদের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল, সুতরাং তিনি শীঘ্রই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

ব্যবহারাজীব। এই সময়ে প্রখ্যাতনামা প্রসন্নকুমার ঠাকুর সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিয়া প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। রমাপ্রসাদ চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নকুমারের ন্যায় স্বাধীনভাবে ওকালতী করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন। 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রের একজন লেখক লিখিয়াছেন যে রমাপ্রসাদের ওকালতীতে প্রবেশ করিবার সময় একটু গোলযোগ হইয়াছিল। এই সময়ে একটী নূতন নিয়ম প্রচলিত হয়, সেই নিয়মানুসারে প্রধান বিচারপতি জন্ রাসেল কল্‌ভিন্ তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র আনিতে বলেন। রমাপ্রসাদ তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষকে এই বিষয়ে বলিলে, রামগোপাল অবিলম্বে ভারত-



প্রসন্নকুমার ঠাকুর

বন্ধু ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নিকট গিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন তখন এ দেশের ব্যবস্থাসচিব ছিলেন এবং তাঁহার অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণর স্যর জন্ লিট্‌-লারকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন 'যদি নেলসনের পুত্র নৌ-বিভাগে কর্ম্মপ্রার্থী হইতেন তাহা হইলে কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিফল মনোরথ করিতে পারিতেন? যদি রামমোহন রায়ের পুত্রকে বিচারালয়ে নিজের চেষ্টাতেও অর্থোপার্জ্জন করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এত-দ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের কলঙ্কের বিষয়।" বেথুনের সুপা-রিসের ফলে রমাপ্রসাদের নাম উকীল শ্রেণীভুক্ত হয়। প্রথম বৎসর রমাপ্রসাদের তাদৃশ আয় হইল না, কিন্তু চাকুরীতে তিনি যে বেতন পাইতেন, দ্বিতীয় বৎসর ওকালতীতে তাহার দ্বিগুণ আয় হইল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকট তিনি অনেক সাহায্য লাভ করেন। অন্যান্য পিতৃবন্ধুগণের সাহায্যে রমাপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে আরও উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রসন্নকুমার অবসর গ্রহণ করিলে রমাপ্রসাদ প্রধান বিচার-পতি মিষ্টার জন রাসেল কল্‌ভিনের সুপারিষে লর্ড ডালহৌসী কর্ত্তৃক তাঁহার স্থানে সরকারী উকীল নিযুক্ত



লর্ড ডালহৌসী

হইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার আর প্রতিষ্ঠার সীমা রহিল না। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমস্ত প্রসার ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইলেন। যেরূপ দক্ষতার ও নিপুণতার সহিত তিনি কার্য্য করিতেন তাহাতে ইংরাজ বিচারকগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন। শিক্ষিত বঙ্গবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু মাননীয় জে, আর কল্‌ভিন তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। আট বৎসর কাল কলেক্টরের কার্য্য করিয়া জমি ও খাজনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক নিয়মাদিতে তাঁহার অসামান্য জ্ঞান হইয়াছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকাংশ মোকদ্দমাই জমি ও খাজনা সংক্রান্ত। সুতরাং রমাপ্রসাদ অতি সুন্দরভাবে এই সকল মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার য়ুরোপীয় ও দেশীয় প্রতিদ্বন্দীরা কিছুতেই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিতেন না। রমাপ্রসাদের অসাধারণ তর্কশক্তি ছিল এবং দুরূহ বিষয়গুলিকেও সরল ও সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি বাগ্মী ছিলেন না কিন্তু শান্ত ও ধীরভাবে আপনার বক্তব্য বলিয়া যাইতেন, কখনও একটীও অনাবশ্যকীয় কথা বলিতেন না। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় বিচারশক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন না। তিনি কিছুতেই উষ্ণ হইতেন না।

সদর দেওয়ানী আদালতের সর্ব্বপ্রধান উকীলরূপে দেশীয় ও য়ুরোপীয় নানা শ্রেণীর নানা প্রকারের ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার অমায়িক ও বিনয়নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতেন। এইরূপে তিনি সকল সমাজের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং সকল সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় ও দেশীয় সমাজের মধ্যে বন্ধন স্বরূপ ছিলেন। রাজনীতি-বিশারদ কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন যে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে আর কোনও বাঙ্গালী রমাপ্রসাদের ন্যায় য়ুরোপীয় সমাজে এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

গুণগ্রাহিতা। রমাপ্রসাদ অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। ভবিষ্যতে যিনি হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই মনীষী দ্বারকানাথ মিত্রের জীবন-প্রভাতে রমাপ্রসাদই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া গুণগ্রাহী রমাপ্রসাদ তাঁহাকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন সে সাহায্য না পাইলে দ্বারকানাথ অত শীঘ্র

প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। দ্বারকানাথের একজন চরিতকার রমাপ্রসাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :—

"রমাপ্রসাদ বাবু সে সময়ে গবর্ণমেণ্টের সিনিয়র উকীল এবং উকীলবারের প্রধান ছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার ক্ষমতা অতুলনীয় ছিল, সুতরাং নূতন উকীলদিগের অনেকে তাঁহার সুনজরে পড়িবার চেষ্টা করিত। রমাপ্রসাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকলের উপর থাকিত, যোগ্য লোক পাইলে তিনি সন্তুষ্টমনে তাহাকে সাহায্য করিতেন। দ্বারকানাথ বারে প্রবেশের অল্পদিন মধ্যে রমাপ্রসাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন, রমাপ্রসাদ বাবু ইঁহাকে বিশিষ্ট বুদ্ধিমান ও কাজের লোক দেখিয়া অনেক সময় নিজের সহকারী বা জুনিয়ার করিয়া লইতেন।"

রমাপ্রসাদেরই চেষ্টায় 'ব্যবস্থা দর্পণ' প্রণেতা দরিদ্র-সন্তান শ্যামাচরণ সরকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান অনুবাদকের পদলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাবু (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ওকালতীর প্রথম অবস্থায় রমাপ্রসাদের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন।

রমাপ্রসাদের গুণগ্রাহিতার আর একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মৌলবী (পরে নবাব



দ্বারকানাথ মিত্র

বাহাদুর) আবদুল লতিফ খাঁ জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে সেই ডিভিসনের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত করেন। তিনি জাহানাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার সময় রমাপ্রসাদের নেতৃত্বে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আবদুল লতিফকে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎকালে অভিনন্দনপত্র প্রদানের প্রথা এতদূর বিস্তৃতিলাভ করে নাই। কিন্তু দেশের এইরূপ উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা গুণগ্রাহী রমাপ্রসাদের নিকট দোষাবহ মনে হইয়াছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে ডিসেম্বর তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে রমাপ্রসাদ আবদুল লতিফের উচ্চপ্রশংসা করিয়া করিয়া তৎসহিত অভিনন্দন পত্রটি প্রেরণ করেন। বিনয়ের অবতার আবদুল লতিফ যে প্রত্যুত্তর দেন তাহার শেষভাগে রমাপ্রসাদকে লিখিয়াছিলেন :—

"In conclusion allow me to state that if any thing could add to the value of the address I am now acknowledging it is the act of the subscribers in making you the medium of its presentation."

শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহ। দেশে শিক্ষাবিস্তারে রমাপ্রসাদের অসীম আগ্রহ ছিল। ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-



নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর

বিষয়ক রিপোর্ট দৃষ্টে প্রতীত হয় যে বাঁশবেড়িয়ায় রমপ্রসাদ একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। উহাতে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের শিক্ষা প্রদত্ত হইত।*

শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ এই পাঠশালার শিক্ষক এবং সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দুরীতি অনুসারে বেতন না লইয়া বিদ্যাদান করা হইত।

আলেকজাণ্ডার ডফ্ প্রভৃতি খ্যাতনামা খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে হিন্দু বালকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" প্রতি-

---

* There is an English school at Bansbaria, an ancient seat of Hindu learning, supported by Babu Debendra Nath Tagore and Rama Prasad Ray, the sons of distinguished fathers. It is established for the diffusion of Vedantic principles."

ষ্ঠিত করেন। ‡ রমাপ্রসাদ দেবেন্দ্রনাথকে এই বিদ্যালয় স্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং এই বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও রাজনারায়ণ বসু উহার পরিদর্শক ছিলেন।

শিক্ষা পরিষদ। কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত একটি শিক্ষা পরিষদ এদেশে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিতেন এবং শিক্ষাবিষয়ক সকল প্রশ্নের সমাধান করিতেন। রমাপ্রসাদ কিছুকাল এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে পরিষদকে বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। সে সকল প্রশ্নের সমাধানে মনীষী রমাপ্রসাদের সুচিন্তিত মন্তব্যাদি যে কতদূর সহায়তা করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন যে যুক্তপ্রদেশে প্রচলিত শিক্ষা

---

‡ যাঁহারা এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানিতে চাহেন তাহারা ১৮৩৮ শকের বৈশাখের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন।

প্রণালীর গুণে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য সেইরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করার ঔচিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে বিবেচনা করিতে বলেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে এই সময়ে রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকাদির ও তাহার রচয়িতৃগণের নামের তালিকা সম্বলিত সুপ্রসিদ্ধ রিপোর্ট লিখেন এবং রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি শিক্ষাপরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের সুচিন্তিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে রমাপ্রসাদের এই সকল মন্তব্যাদির (Minutes) পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে রমাপ্রসাদ উহার প্রথম 'ফেলো' বা সদস্য নির্ব্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে তিনি ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রধান সদস্য ছিলেন। এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যও রমাপ্রসাদ যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

বেথুন স্মৃতিসভা। শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের সহিত রমাপ্রসাদের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য ছিল। বেথুনের মৃত্যুর পর বঙ্গবাসী তাঁহার

স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট দিবসে মেডিক্যাল কলেজের হলে একটী বৃহৎ সভা আহূত করেন। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি এই সভায় নিম্নোদ্ধৃত প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং বেথুনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে পঞ্চাশ টাকা দান করেন :—

That this meeting desires to record its deep sense of the loss which the cause of education and the general advancement of the people of this country have sustained by the lamented death of the Hon'ble J. E. D. Bethune. From the day he landed in India to his last hour, his unceasing endeavours and best energies were devoted to the improvement of the Native mind and the elevation of the Native character. For the attainment of these noble ends, he made himself accessible to the humblest individual sacrificing his time, health and money with rare disinterestedness. Not satisfied with his

exertions to advance the best interests of man in British India, he made it the project of his hourly thoughts aud darling hopes to elevate woman in the social scale by that which only can be effectual to that end, education, with an earnestness, a self-devotion and a munificence which will ever live in the recollection of a grateful people.

বেথুন সভা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাপরিষদের ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্পাদক ডাক্তার এফ্ জে মৌয়েট কতিপয় য়ুরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতায় ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব ও শিক্ষাপরিষদের সভাপতি পরলোকগত ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মরণার্থে 'বেথুন সোসাইটী' নামক একটী সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগস্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী ও উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। এই সভা এক্ষণে জীবিত নাই, কিন্তু এককালে ইহার অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল এবং এ দেশের

অনেক কল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার রোয়ার, ডাক্তার চিভার্স, কর্ণেল গুডউইন্, কর্ণেল ম্যালিসন, রেভারেণ্ড ডল, রেভারেণ্ড স্মিথ, হেনরী উড্রো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয়গণ এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র বসু, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সূর্য্যকুমার গুডিব্ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রলাল সরকার, নবীনকৃষ্ণ বসু, কালীকুমার দাস প্রভৃতি বাঙ্গালী মনীষিগণের বাগ্মিতায় যখন সভাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত তখন উহার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! গবর্ণর জেনারেল, লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এই সকল পণ্ডিতগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য সভাগৃহে আগমন করিতেন। মধ্যে এই সভা একবার অতি হীনাবস্থায় পতিত হয়। এমন কি, উহা বিলুপ্ত হইবারও সম্ভাবনা হয়। এই সময়ে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে) সভার কয়েকজন হিতৈষী পুরাতন সভ্য সভাকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্‌কে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত করেন। ডাক্তার ডফ্ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহের সহিত এই সভার সভাপতিত্ব স্বীকার করেন। এবং

অতি অল্প দিনের মধ্যেই উহাকে নূতন জীবনে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি এই সভাকে ছয়টী শাখায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক শাখার কার্য্য সুসম্পাদিত করিবার মানসে উপযুক্ত ও বিচক্ষণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। এই শাখাগুলি ও তাহার সভাপতি ও সম্পাদকদিগের নাম এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য :—

শিক্ষা	সভাপতি - মিষ্টার হেনরী উড্রো সম্পাদক—বাবু রাজেন্দ্র নাথ মিত্র
সাহিত্য ও দর্শন	সভাপতি—মিষ্টার ই, বি কাউয়েল সম্পাদক—বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বিজ্ঞান ও শিল্প	সভাপতি—মিষ্টার এইচ, এস, স্মিথ সম্পাদক—মিষ্টার - জে রীজ্
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতি	সভাপতি—ডাক্তার নরম্যান চিভার্স পরে ডাক্তার ক্রহাম সম্পাদক—বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু

সমাজবিজ্ঞান	সভাপতি—মিষ্টার জেম্‌স্ লঙ্ সম্পাদক—বাবু কালিকুমার দাস
এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি	সভাপতি—বাবু রমাপ্রসাদ রায় সম্পাদক—বাবু হরচন্দ্র দত্ত

শেষোক্ত শাখায় এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ক প্রশ্নাদির আলোচনা হইত। এই আলোচনায় এতদ্দেশীয় সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির প্রয়োজন বলিয়া, (ডাক্তার ডফের কথায়) "a native gentleman of the highest qualification"—রমাপ্রসাদ রায়কে উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ্চ দিবসে বেথুন সভায় মিষ্টার ওয়াইলি নামক একজন য়ুরোপীয় "হানামুর ও স্ত্রীশিক্ষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি ডাক্তার ডফ্, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, রেভারেণ্ড মিষ্টার সি, এইচ, এ, ডল্, রমাপ্রসাদ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কালীকুমার দাস, সার বর্টল্ ফ্রেয়ার (পরে বোম্বাইয়ের

গবর্ণর) প্রভৃতি এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। রেভা রেণ্ড ডল্ এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যে, ধনী ও ক্ষমতাশালী হিন্দুগণ তাঁহাদের গৃহে খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে আপত্তি করিয়া থাকেন শুনা যায়, সেই কথা সত্য কি না। রমাপ্রসাদ ইহার উত্তরে বলেন যে আজিকালি সচরাচর কেহ সেরূপ আপত্তি করেন না। ত্রিশ বৎসর, এমন কি দশবৎসর পূর্ব্বেও এবিষয়ে আমাদের যে সংস্কার ছিল এক্ষণে তাহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে গবর্ণমেণ্ট যথোচিত সাহায্য করিতেছেন না বলিয়াই স্ত্রীশিক্ষা এদেশে তাদৃশ বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিতেছে না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বর দিবসে বেথুন সভায় ডাক্তার ডফ্ ঘোষণা করেন যে পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে রমাপ্রসাদ রায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক শাখার কার্য্য বিবরণী পাঠ করিবেন। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ উহা ঐ বৎসর পঠিত হয় নাই। বেথুন সভায় কার্য্যবিবরণী নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় এক্ষণে জানিতে পারা যায় না যে পরে রমাপ্রসাদ কোনও অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন কি না।

কল্‌ভিন স্মৃতিসভা। সদর আদালতের অন্ত-তম বিচারপতি মিষ্টার জন রাসেল কলভিন্ রমাপ্রসাদকে খুব

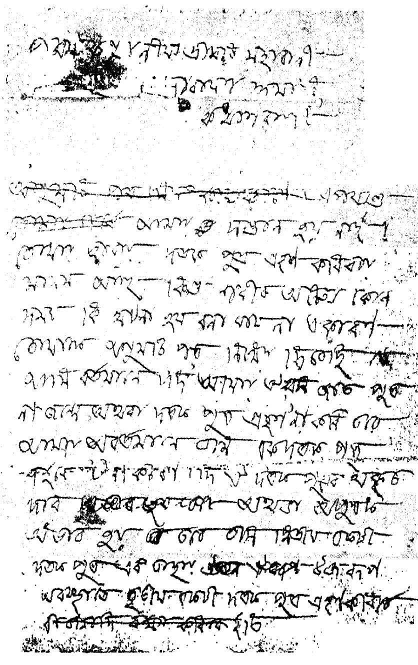
স্নেহ করিতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর হন। সিপাহীযুদ্ধের সময় তিনি যথেষ্ট কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম ও উদ্বেগে জরাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং আগ্রা দুর্গে সমাহিত হন। রমাপ্রসাদ তাঁহার এই পরম উপকারকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে মেটকাফ হলে একটি সভা আহূত করেন এবং একটি মনোরম বক্তৃতা করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর জেমস্ কলভিন্, এডভোকেট জেনারেল মিষ্টার উইলিয়ম রিচি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণও এই সভায় বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় দুর্ভিক্ষ।

রমাপ্রসাদ নীরবকর্ম্মী ছিলেন, হুজুগপ্রিয় ছিলেন না। দেশহিতকর সভাসমিতির কার্য্যে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল কিন্তু তিনি নিষ্ফল রাষ্ট্রীয় আন্দোলনাদিতে যোগদান করিতে ভালবাসিতেন না বা বক্তারূপে প্রসিদ্ধিলাভের প্রয়াস পাইতেন না। প্রকাশ্য সভাসমিতিতে তিনি যে দুই একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার গভীর চিন্তাশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবের

উচ্ছ্বাসে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়কে অভিভূত না করিয়া তিনি সুচিন্তিত মন্তব্যের দ্বারা তাহাদিগের মনকে মুগ্ধ করিতেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারীদিগের সাহায্য কল্পে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২১শে জানুয়ারী দিবসে চেম্বার অব কমার্স সভার গৃহে কলিকাতাবাসী একটি সাধারণ সভা আহূত করেন। এই সভায় রমাপ্রসাদই সর্ব্বপ্রথমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ ও তন্নিবারণের প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আমি স্বয়ং অনুধাবন করিয়া যাহা দেখিয়াছি এবং অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে যে সম্বাদ পাইয়াছি তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রাচুর্য্য, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সর্ব্বত্র দারিদ্র্য ও অভাব পরিলক্ষিত হয়। সত্য বটে, স্থানে স্থানে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ভূম্যধিকারী পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া পঞ্চাশ বা একশত মাইল দূরে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল মাত্র অভাব ও দারিদ্র্যে প্লাবিত। এই সভায় একজন একটি কাল্পনিক বিপদের বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে সেরূপ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারীদিগের সাহায্যে কোন ফল ফলিবে না। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি এইরূপ



রামপ্রসাদ রায়ের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর

বিপদ আসে তাহা হইলে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বর্ত্তমান সময়ের বা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ন্যায় উহা তত ভীষণ আকার ধারণ করিবে না। উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় ভূমিকর সংক্রান্ত ব্যবস্থার ফলে সেখানে জমীদারশ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছে—জমীদারগণ কেবল মাত্র পত্তনীদারে পরিণত হইয়াছেন, এবং যদিও আমি বলিতেছি না যে প্রধানতঃ সেই দেশের ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার দোষেই এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তথাপি আমার স্থির বিশ্বাস যে তত্রত্য অধিবাসিগণের সুখ দুঃখের সহিত এই রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থা অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত আছে এবং গবর্ণমেণ্টের এই সকল ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা অবশ্যকর্ত্তব্য।"

লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সার। এই সময়ে রমাপ্রসাদ বৎসরে লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। লর্ড ক্যানিং ও সার জন পিটার গ্রাণ্ট রমাপ্রসাদকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কোনও নূতন বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে জটিল প্রশ্নাদি উত্থাপিত হইলে তাঁহারা রমাপ্রসাদের অভিমত জানিতেন এবং অধিকাংশ স্থলে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। Civil Procedure Bill, Rent Bill, Sale Law, Penal Code, Criminal Procedure, Limitation Laws, Income Tax Act প্রভৃতি অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় তিনি

Act প্রভৃতি অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে তাঁহার অভিমত ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভা তাঁহার মন্তব্যের দ্বারা অনেক উপকৃত হইয়াছিল। রমাপ্রসাদ দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের যে বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি মিষ্টার বোফোর্টের স্থানে লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সারের পদে নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। এই পদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াও তিনি ওকালতী করিতেন।

"ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী।" ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। এই সময়ে তিনি বিশ্রামের জন্য মধ্যে মধ্যে আলমবাজার বা রাণীগঞ্জের উদ্যানবাটিকায় সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু রমাপ্রসাদের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অলস ভাবে সময় অতিবাহিত করা অসম্ভব। তিনি এই সময়ে আইনগ্রন্থাদির টীকা প্রণয়ন করিতেন। এই সময়ে How we are governed নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন করিয়া তিনি "ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী'

নামক একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত করিতে স্বর্গীয় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীকে সাহায্য করেন। পুস্তকখানি সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে রমাপ্রসাদ কতদূর সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা পুস্তকখানির ভূমিকাদৃষ্টে প্রতীত হয়। এই গ্রন্থখানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের আদেশানুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সার জন পিটার গ্রাণ্ট লর্ড ক্যানিংএর অনুমতি লইয়া রমাপ্রসাদকে এই সভার অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত করেন। এই সভায় আরও তিনজন দেশীয় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও অতি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও মৌলবী (পরে নবাব) আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের যোগ্যতায় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন দেশীয় সদস্যই রমাপ্রসাদের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় রমাপ্রসাদের কার্য্য সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"In the Legislative Council of Bengal to



কৃষ্ণদাস পাল

which he was nominated on its formation as a Government member, we may say that he was the only man who shewed mettle at all. He approached the questions before it with an intelligence, an appreciation of public wants and feelings, a sagacity, boldness and an authority that certain knowledge and strong intellect always give which not only defied opposition in the Council, but challenged admiration out of it."

ক্যানিং স্মৃতিরক্ষা সভা। করুণার অবতার লর্ড ক্যানিংএর ভারত পরিত্যাগ কালে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের ব্যবস্থার জন্য দেশবাসিগণ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারী দিবসে টাউনহলে একটি বিরাট সভা আহূত করেন। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া একটি মনোরম বক্তৃতা করেন। এই প্রস্তাবে ক্যানিংএর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তির জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডের কোনও উপযুক্ত শিল্পীর নিকট বসিতে অনুরোধ করা



লড ক্যানিং

হয়। কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত রমাপ্রসাদের ইংরাজী বক্তৃতাটির মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আমি তৃতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি এবং অতীব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব আপনাদের বিবেচনার জন্ত উপস্থাপিত করিতেছি। রাজকর্ম্মচারী বলিয়া এইরূপ সাধারণ অবস্থায় আমি যোগদান করিতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি সেরূপ কোনও সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি না। আমার মনে হয় যে কোন ব্যক্তি রাজকর্ম্ম গ্রহণ করিলেই যে তাহাকে জাতীয়ত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে, সকল সৎ ও মহৎ ভাবের অনুভূতি বিসর্জ্জন দিতে হইবে, ন্যায়পরতা ও মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিরত হইতে হইবে এবং যাঁহারা ন্যায়তঃ আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে এইরূপ যুক্তি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। ভদ্র মহোদয়গণ, আমরা আজ একটি বিশেষ এবং অসাধারণ কার্য্যোপলক্ষে সমবেত হইয়াছি। শাসনকার্য্যের অবসানে গৃহপ্রত্যাগমনোন্মুখ গবর্ণর জেনারেলকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদানের জন্য এই বিশাল রাজধানীর অধিবাসিগণ যে এই প্রথম সমবেত হইলেন তাহা নহে। বহুবার আমরা এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে সম্মিলিত হইয়াছি। কিন্তু মহাশয়গণের স্মরণ থাকিতে পারে যে সেই সকল সভা য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত, য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক আহূত এবং য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। আজিকার এই বিরাট সভা ভারতবাসীর

দ্বারা আহূত। ইহা কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের সভা নহে, শাসক সম্প্রদায়ের ইঙ্গিতে এই সভা আহূত হয় নাই। পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আজিকার এই সুন্দর সন্ধ্যায় ভারতবর্ষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রকে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন।

"ভদ্র মহোদয়গণ, যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলেও এই ক্ষুদ্র বক্তৃতায় ভারতবর্ষের জন্য লর্ড ক্যানিং যে প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইত না। সে সকল কার্য্যের পুনরালোচনা করিলে হয়ত আপনারা এমন কিছু দেখিতে পাইবেন না যাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায় বা হৃদয় বিমুগ্ধ হয়। বিরাট অথবা গৌরবময় যুদ্ধ সংঘটিত ও বিজিত হইয়াছে, বিশাল রাজ্যবিস্তৃতি ঘটিয়াছে, তাঁহার শাসনকালে আপনারা হয়ত এরূপ ঘটনার কথা শুনিতে পাইবেন না, কিন্তু মহাশয়গণ, লর্ড ক্যানিং এমন কতকগুলি স্থায়ী উন্নতি সাধিত করিয়াছেন, আপনাদের কল্যাণের জন্য, আপনাদের প্রিয়তম অধিকারগুলি রক্ষার জন্য, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য, এমন অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠিত করিয়াছেন, যে সে সকলের আলোচনা করিলে আপনারা এবং আপনাদের উত্তরপুরুষগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারক বলিয়া লর্ড ক্যানিংএর নাম চিরদিন পূজা করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান দেখিবেন। কোনও জাতির ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই—ভারতবর্ষের সেই মহাসঙ্কটকালে তিনি কিরূপে আমাদিগকে এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাদের পর আমাকে কি

তাহা পুনরায় বিবৃত করিতে হইবে ? যখন য়ুরোপীয়দিগের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যখন আর্যদের কোটি কোটি দেশবাসীর মধ্যে কয়েকজন মাত্র ভ্রান্ত ব্যক্তির নৃশংস কার্য্য তাঁহাদিগকে প্রতিহিংসাগ্রহণে ও বৈরনির্য্যাতনে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন এই মহাপুরুষের অদম্য সাহস, অবিচলিত ন্যায়পরতা, সংযম ও মনুষ্যত্ব, অগণ্য নির্দ্দোষীকে অকাল ও কলঙ্কিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল, মহারাজ্ঞীর রাজভক্ত লক্ষ লক্ষ প্রজা তাহাদের জীবন ও স্বত্বসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাঁহারই কৃপায় আজি আমরা এই বৃহৎ সভায় স্বাধীন নাগরিকরূপে বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যের গৌরব লইয়া সমবেত হইতে সমর্থ হইয়াছি। মহাশয়গণ, ইহা তাঁহার শাসনকালের অন্ধকারময় দুর্দ্দিনের কথা—যাহাকে হিন্দুমতে তাঁহার শাসনের লৌহযুগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি তাঁহার শাসনকালের সুবর্ণযুগের কথা—সুদিনের কথা---স্মরণ করেন তাহা হইলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে দেশের মধ্যে শান্তি ও ঐক্যস্থাপন এবং ভারতবর্ষের আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের দ্বারা তাঁহার শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসর বিশেষিত হইয়াছে। অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ নীরব এবং কামানের মুখ বন্ধ হইবামাত্র লর্ড ক্যানিং সকলকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে না দেখিয়া (হয়ত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা সে অবস্থায় দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না) অসাধারণ মহত্ত্ব সহকারে ধীর ও শান্তভাবে, রাজভক্ত ও রাজদ্রোহীদিগকে ন্যায়পরতা অথবা করুণার সহিত বিচার পূর্ব্বক যথাযোগ্যভাবে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

"মহাশয়গণ, অযোধ্যার বাজেয়াপ্ত ভূসম্পত্তি প্রত্যর্পণের কথা

সেই প্রদেশের নূতন বন্দোবস্তের কথা, শিশুহত্যা নিবারণের কথা স্মরণ করুন, অথবা স্বধর্ম্মানুসারে এতদ্দেশীয় রাজা মহারাজাদিগের দত্তক পুত্রগ্রহণের প্রতিবন্ধকাদি বিদূরিত করিবার কথা স্মরণ করুন, অথবা বিচারবিভাগের সংস্কারের কথা, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে জীবন ও সম্পত্তি নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে দিবার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি প্রণয়নের কথা, শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহদানের কথা, অর্থশাস্ত্রসম্মত নিয়মানুসারে য়ুরোপীয় মূলধনের আমদানী করিয়া দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির কথা স্মরণ করুন, এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষার চেষ্টার কথা, ভূমিস্বত্ব ও পতিত জমি বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির কথা স্মরণ করুন, আপনারা দেখিতে পাইবেন যে ভারতবর্ষের কল্যাণই লর্ড ক্যানিংএর চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল। তাঁহার শাসনকার্য্যের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ—যাহাকে ভ্রান্তলোক 'নেটিব' রাজ্যশাসন প্রণালী বলেন—সেই জাতীয় রাজ্যশাসন পদ্ধতি প্রচলনের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই পদ্ধতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লর্ড ক্যানিংএর শাসন কালেই উহা প্রচলিত হয়। ভূম্যধিকারী এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দেশ, জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেশের উন্নতিবিধানের জন্য দায়িত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়া তিনি ভারতবর্ষে একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় সর্ব্বোচ্চ রাজকার্য্যে দেশীয়দিগকে য়ুরোপীয়দিগের সহিত সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি কখনও কল্পনাও করিতে পারিতেন, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাঁহাদের কি তাহা

শুনিবারও সম্ভাবনা ছিল, যে রাজা দিনকর রাও বা রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের ন্যায় দেশবাসী ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ও লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণরের সহিত সাম্রাজ্যশাসন সভায় একত্রে উপবেশন করিয়া সেই অতুল প্রতাপান্বিত শাসনকর্ত্তাদিগকে দেশহিতকর বিষয়ে পরামর্শ দিবেন?

"ভদ্রমহোদয়গণ, এই সকল এবং এইরূপ কার্য্যের দ্বারা লর্ড ক্যানিং মহারাজ্ঞীর সাম্রাজ্যে শান্তি, সুখ, সন্তোষ ও রাজভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য, তাঁহার সদনুষ্ঠান সমূহের স্মৃতিরক্ষার জন্য, তাঁহার বিচক্ষণ এবং উদার নীতি পরিচালিত সৎকার্য্যের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য আমরা অদ্য এইস্থানে সমবেত হইয়াছি, এবং ইহা আশা করা যায় যে, আমরা অদ্য এই সভায় যাহা করিব এবং সঙ্কল্প করিব তদ্দ্বারা জগৎকে দেখাইতে পারিব যে সুশাসনকর্ত্তার সৎকার্য্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে এবং তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে ভারতবর্ষ কখনই পশ্চাৎপদ নহে।

"মহাশয়গণ, যে মহাত্মাকে আমরা শোকাকুলিত হৃদয়ে বিদায় দিতেছি তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত কি স্মৃতি চিহ্ন স্থাপিত হওয়া উচিত তাহা আমি কল্পনা করিতে অক্ষম। কিন্তু যে প্রস্তাবটি আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে তাহা গ্রহণ করিতে বলিবার সময় আমি আগ্রহের সহিত এই অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা যে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবেন তাহা যেন লর্ড ক্যানিংএর উপযুক্ত হয়, তাঁহার মহৎ এবং প্রশংসনীয় কার্য্যের উপযুক্ত হয় এবং ভারতবর্ষ ও তাহার লক্ষ লক্ষ অধিবাসী, যাহাদের

প্রতিনিধিরূপে আপনারা এস্থানে সমবেত হইয়াছেন, তাহাদের উপযুক্ত হয়।"

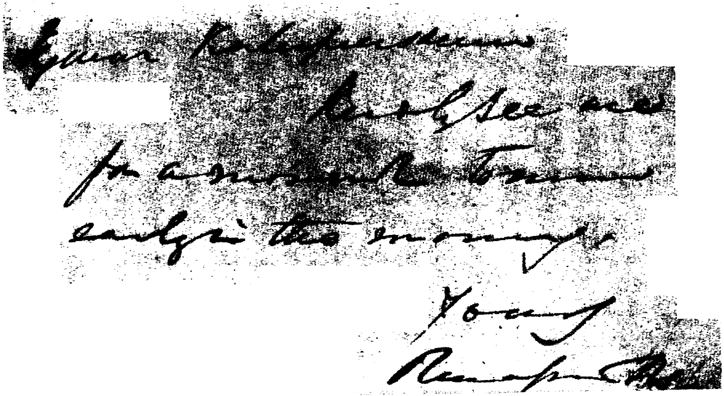
লর্ড ক্যানিংকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার জন্য এই সভায় যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ একজন। রমাপ্রসাদ লর্ড ক্যানিংএর স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং স্মৃতিরক্ষার জন্য পাঁচশত টাকা দান করিয়াছিলেন।

গ্রাণ্ট স্মৃতিরক্ষা সমিতি। দুই মাস পরে সর্ব্বজনপ্রিয় লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর সার জন্ পিটর গ্রাণ্টকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে যে সকল দেশনায়ক তৎসমীপে গমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে রমাপ্রসাদকে দেখিতে পাওয়া যায়। রমাপ্রসাদ তাঁহার স্মৃতিরক্ষা সমিতির অন্যতম সদস্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি। পূর্ব্বে এদেশে সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট নামক দুইটি সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় ছিল। সদর আদালত বা কোম্পানির আদালতে মফঃস্বল কোর্টের মোকদ্দমার আপীল শুনা হইত। এই আদালতের বিচারপতিদিগের দেশের আচার ব্যবহারাদি

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন বলিয়া এতদ্দেশীয় বিচারকগণের মধ্য হইতে ইঁহারা নির্ব্বাচিত হইতেন। সুপ্রিম কোর্টের বা মহারাজ্ঞীর আদালতের বিচারপতিগণ বিলাত হইতে আসিতেন। বলা বাহুল্য এই দুই আদালতের বিচারপতিদের মধ্যে প্রায় মনোমালিন্য ঘটিত। দুইটী বিচারালয় একত্র করিয়া একটী হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে একবার উঠিয়াছিল কিন্তু কোন কারণ বশতঃ উহা স্থাপিত করা তখন যুক্তিযুক্ত বোধ হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস উড্ পার্লিয়ামেণ্টে হাইকোর্ট স্থাপনের কথা পুনরায় উত্থাপিত করেন এবং বিচারপতি নিয়োগ সম্বন্ধেও নূতন নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মহাত্মা লর্ড ক্যানিং তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ উদারতার সহিত "expressed a decided opinion that Native Judges well trained, were as well qualified as any other persons to take their places by the side of English Judges in the High Court."

রমাপ্রসাদের অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখিয়াই যে লর্ড ক্যানিং তাঁহার এই অভিমত গঠিত করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান



রমাপ্রসাদ রায়ের ইংরাজী হস্তাক্ষর

করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। লর্ড এল্‌গিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী মাননীয় টি, জে, হভেল-থার্লো (Hon'ble T, J. Hovell-Thurlow) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "The Company and the Crown" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

'On its (High Court) bench two new and startling precedents had been adopted. Natives were to be appointed to this high tribunal, with power to judge our countrymen in criminal as well as civil cases; and for the first time, natives of high rank became entitled to the same emoluments as their English colleagues. * * * The statutes of the Court had been thus liberally framed, bearing in view a man of proved integrity and parts. Ramapersad Roy was a name, at the very sound of which corrupt vakeels or pleaders quitted court. He was without price, and the office had been made for him; but ere the letters patent had

reached Calcutta he had died. Shumbhoonath Pundit Roy Bahadoor indeed was found to reap the honours invented for another; but the new High Court went forth shorn of its greatest ornament."

প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও অবশেষে এই বৎসর পার্লিয়ামেণ্টের নূতন বিধি দ্বারা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা মঞ্জুর হইল এবং একজন দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করিবার ও আদেশ আসিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠিত হইল। রমাপ্রসাদ অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ছিলেন না যিনি এই পবিত্র ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড এলগিন্ তাঁহাকে এই পদের জন্য মনোনীত করিলেন এবং মাননীয় মিষ্টার হ্যারিংটনকে দিয়া রমাপ্রসাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে ভারতসম্রাজ্ঞী তাঁহাকেই এই উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন কিন্তু তখন অত্যধিক পরিশ্রম জনিত রোগে রমাপ্রসাদ মৃত্যুশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন। দেশবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা দেখিয়া রমাপ্রসাদের আনন প্রফুল্ল হইল। তিনি হ্যারিংটনকে ধন্যবাদ দিয়া স্মিতমুখে

বলিলেন, "আমি এখন উচ্চতর বিচারালয়ের সম্মুখে যাই-তেছি। নিয়োগ পত্র লইয়া আমি কি করিব?" *

পরলোক গমন। বাস্তবিক ব্যবস্থাপক সভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য, লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সারের পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য, সদর আদালতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবের কার্য্য, এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের গুরুভারে রমা-প্রসাদ বহুদিন হইতেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি দিন রাত্রি তিনি কর্ম্মে নিরত থাকিতেন। মানুষের শরীরে কত সহ্য হয়? ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি যকৃৎরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। ডাক্তার এবেব, ডাক্তার গুডিব, ডাক্তার ম্যাক্‌রে, ডাক্তার গুপ্ত, সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি সহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক-

* অমর কবি দীনবন্ধু তদ্বিরচিত 'সুরধুনী'কাব্যে রামাপ্রসাদের অকালমৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন:—

"আইন পারগ রমাপ্রসাদ প্রবর
সাধিতে স্বদেশ হিত ছিলেন তৎপর।
প্রথমে বিচারপতি সেই বিজ্ঞ হয়,
অস্তমিত হ'ল কিন্তু না হতে উদয়,
অভিষেক দিনে গেল শমন ভবনে,
কোথা রাম রাজা হয় কোথা গেল বনে।"

গণের প্রাণপণ চেষ্টাতেও রোগের উপশম হইল না। বাহির সিমুলিয়ার বাটী হইতে চৌরঙ্গীতে স্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া চিকিৎসা করা হইতে লাগিল। যখন রোগে শয্যাগত তখনও রমাপ্রসাদ দেশের কথা ভুলেন নাই। তিনি আত্মীয় বন্ধুগণকে সংবাদপত্র পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে বলিতেন এবং জনহিতকর অনুষ্ঠানাদির সংবাদ লইতেন। যখন ইংলিশম্যানের টেলিগ্রাম লর্ড ক্যানিংএর মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিল, তখন রমাপ্রসাদের নয়নে অশ্রু দেখা দিল। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভারতবর্ষ তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারাইয়াছে!" সেইদিন হইতে তাঁহার মনে এক-প্রকার ধারণা হইল যে তাঁহারও মৃত্যুকাল আসন্ন। তাঁহার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাননীয় মিষ্টার হ্যারিংটন, মাননীয় মিষ্টার রেকস্, প্রফেসার লীজ, মিষ্টার কক্রেন্ প্রভৃতি সুপ্রিম কৌন্সিলের সদস্য, জজ, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক,হইতে সামান্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত রমাপ্রসাদের সকল শ্রেণীর বন্ধু ও প্রতিভাপূজকগণ তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য সংবাদ লইতে লাগিলেন। কিন্তু দেশবাসীর ও বিদেশবাসীর শ্রদ্ধা, সম্মান, ও প্রীতির আধার, রমাপ্রসাদের কাল পূর্ণ হইয়াছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা

আগষ্ট (১৮ই শ্রাবণ ১২৬৯ বঙ্গাব্দে শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বঙ্গদেশ একটী প্রকৃত সন্তান হারাইলেন।

স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা। রমাপ্রসাদের মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ শোকে কাতর হইয়াছিল। ইংলিশম্যান, হরকরা প্রভৃতি ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্রও উচ্চকণ্ঠে তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'সোমপ্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে প্রতীত হয় যে এদেশে রমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনেরও চেষ্টা হইয়াছিল :—

"ঢাকাপ্রকাশে বরিশাল হইতে একজন লিখিয়াছেন, তত্রত্য উকীল বাবু বিশ্বেশ্বর দাসের যত্নে তাঁহার বাটীতে রমাপ্রসাদ বাবুর স্মরণার্থ এক চাঁদা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮০০ টাকা উঠিয়াছে, রমাপ্রসাদ বাবুর স্মরণার্থ কি চিহ্ন করা হইবে, সভ্যঃ এখনও তাহা স্থির করেন নাই। এই টাকা ভারতবর্ষীয় সভার নিকটে প্রেরিত হউক। হরিশ সমাজ-গৃহ * নির্ম্মিত হইলে তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ বাবুর এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি, আরও অধিক টাকা সংগৃহীত হইলে

---

* মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, হিন্দু পেট্রিয়টের স্বদেশ প্রেমিক সম্পাদক ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ একটি সমাজগৃহ নির্ম্মিত হউক। Federation Hall

তাঁহার প্রস্তরময়ী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি করা কর্ত্তব্য। হরিশ সমাজ-গৃহকে আমাদিগের জাতিসাধারণ মৃতস্মরণার্থ গৃহ করা কর্ত্তব্য।

(সোমপ্রকাশ ১০ ভাদ্র ১২৬৯)

কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও রমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহার স্মৃতিচিহ্নের অভাব যে আমাদের জাতীয় কলঙ্কের বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।‡

যে উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইবার কথা হয় উহাও সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবার কথা হয়। কালীপ্রসন্ন বাটী নির্ম্মাণের জন্য দুই বিঘা পরিমিত জমি এবং অর্থসাহায্য প্রদান করিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। এই সমাজ গৃহে লর্ড ক্যানিংএর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও স্যর জন পিটার গ্রাণ্টের তৈলচিত্র রক্ষিত হইবারও প্রস্তাব হয়। কিন্তু হরিশ স্মৃতি সমিতি অন্যরূপে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

‡ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সুকিয়াষ্ট্রীটের একটি ক্ষুদ্র অপরিসর গলির নাম "রমাপ্রসাদ রায়ের লেন" রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাকে রমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন বলা যায় না।

রমাপ্রসাদের উত্তরাধিকারিগণ।

রমাপ্রসাদের প্রথমা সহধর্ম্মিণী অতি অল্পবয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রমাপ্রসাদ ৺ মৃত্যুঞ্জয় আগমবাগীশের কন্যা দ্রবময়ীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে সন ১২৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন এবং সন ১২৫৭ সালের কার্ত্তিক মাসে কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীমোহনের জন্ম হয়। ১৩০৩ সালের ১০ই চৈত্র (২২শে মার্চ্চ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে) হরিমোহনের মৃত্যু হয়। তিনি কোনও পুত্রসন্তান রাখিয়া যান নাই, তাঁহার কন্যার বংশধরগণ তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। প্যারীমোহনও সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহারও কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চরিত্র। রমাপ্রসাদ বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। পিতামাতার প্রতি ভক্তিতে রমাপ্রসাদ আদর্শস্থানীয় ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত করিবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল। রামমোহনের পরম বন্ধু রেভারেণ্ড উইলিয়ম আডামকে তিনি জীবনচরিত লিখিতে অনুরোধ করেন এবং

দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু আডাম সাহেবের ভারতবর্ষে পুনরাগমনের পূর্ব্বেই রমাপ্রসাদ পরলোকে গমন করেন। রমাপ্রসাদ মনীষী ও মনস্বী পুরুষ ছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে লিখিয়াছেন, "তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি কেবল বুদ্ধিবলেই এতদূর সম্মান, গৌরব ও যথেষ্ট অর্থ (কেহ বলে ২০, কেহ বলে ৩০ লক্ষ টাকা) অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব বিনীত ও নম্র ছিল, এই গুণে কি য়ুরোপীয়, কি এদেশীয় অনেক প্রধান লোকের সহিত তাঁহার সবিশেষ আত্মীয়তা ও বন্ধুতা জন্মে।" রমাপ্রসাদের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রস্তাব হইতে উপরিলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় রমাপ্রসাদের চরিত্রের দোষগুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"কিন্তু তাঁহার স্বভাবগত একটি অনুষ্কতা দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হইত। এই অনুষ্কতা দোষ নিবন্ধনই তাঁহার প্রকৃত মনস্বিতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি কয়েকটি সদ্‌গুণের অসদ্ভাব ছিল। * * * তাঁহার অল্পমাত্রও সৎক্রিয়াসাহস ছিল না, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পিতা হিন্দুসমাজে খ্যাতিলাভ বাসনা পরিত্যাগ

ও অন্ন অন্ন ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্বদেশের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদিগত দোষ সংশোধন চেষ্টা করিয়া ইহাকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় লইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; তিনি অসার, অপদার্থ ও অসতের নিন্দা ও কটুবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া অকুতোভয়ে যে সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়া যান রমাপ্রসাদ তাঁহার পুত্র হইয়া কেবল এক সৎক্রিয়াসাহস বিরহে সেই পথের পথিক হইতে পারিলেন না। প্রত্যুত তিনি সেই প্রাচীন পঙ্কময় ভগ্নপথের পথিক হইয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন।"

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও অদ্ভুত সৎক্রিয়া-সাহস দ্বারা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেশাচারের প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া বিবিধ স্বদেশহিতকর সমাজ সংস্কারাদি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদের সেইরূপ তেজ বা সৎক্রিয়া-সাহস ছিল না। দেশের কল্যাণকর সকল অনুষ্ঠানের সহিত গভীর সহানুভূতিসত্ত্বেও রমাপ্রসাদের সকল কার্য্যেই তাঁহার সংযম, মিতাচার ও রক্ষণশীলতা পরিলক্ষিত হইত। এই রক্ষণশীল ভাব যে তাঁহার গভীর চিন্তাপ্রসূত ইহা অনেকেই বিস্মৃত হইতেন। আমাদের বোধ হয় যে বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা, উদারতা ও বিবেকানুবর্ত্তিতা যিনি আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সমাজসংস্কারপ্রয়াসী সম্পাদক দ্বারকানাথ, রমাপ্রসাদের

চরিত্র অতি কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, এমন কি, তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অনেক সময়েই দেখা যায় যে উগ্রস্বভাববিশিষ্ট সংস্কারকগণ নির্ভীকভাবে বিবেকের আদেশ অনুপালন করিতে গিয়া, দেশের চিরানুসৃত আচার ব্যবহারাদি প্রবলভাবে আক্রমণ করিতে গিয়া, এরূপ বাধা প্রাপ্ত হন যে তাঁহাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও শক্তিসত্ত্বেও তাঁহারা ঈপ্সিত সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হন না, অথচ শান্ত ও সংযতভাবে সেই সকল সংস্কারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, ধীরে ধীরে সুশিক্ষা দ্বারা কুসংস্কার সমূহ বিদূরিত করিয়া দূরদর্শী নীরবকর্ম্মীরা বিনা বাধায় ক্রমে ক্রমে সমাজে সেই সকল সংস্কার সাধিত করিতে পারেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় সমাজসংস্কারক গণও অনেক সংস্কারের প্রবর্ত্তনে ইচ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক বিচক্ষণ নীরবকর্ম্মীদের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতভাবে সমাজে সেই সকল সমাজসংস্কার-প্রবর্ত্তনের বাসনা যে বলবতী হইয়া উঠিতেছে একথা কে অস্বীকার করিবে? দূরদর্শিতাজনিত সংযমের ভাব অনেক সময়েই দূর হইতে সৎক্রিয়াসাহসের অভাব বলিয়া অনুমিত হয়।

৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রমাপ্রসাদের যে সৎক্রিয়া সাহসের অভাব বা রক্ষণশীলতা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) রমাপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজারামমোহন রায়ের পুত্র, তত্ত্ববোধিনী সভার একজন প্রধান সভ্য, এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ন্যাসরক্ষক ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার স্বর্গগতা বিমাতার আত্মার সদ্গতির জন্য হিন্দুমত তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মধ্যমা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে রামমোহন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হিন্দু আচারানুসারে জননীর মুখাগ্নি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণীর * মৃত্যুর বহুপূর্ব্বেই রামমোহন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। লোকাপবাদ তুচ্ছ করিয়া, জননী যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন সেই ধর্ম্মের অনুযায়ী আচার পদ্ধতি অনুসারে মাতৃভক্ত রমাপ্রসাদ তাঁহার স্বর্গীয়া

---

* রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে Asiatic Journal এ তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত অথচ বহুতথ্যপূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় তাহা পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে, রামমোহন কিছুকাল হইতে তাঁহার কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমতের বিরোধই কি এই সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কারণ?

জননীর আত্মার তুষ্টিবিধান করিয়া যে বিশেষ দোষ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু এই বিষয় লইয়া তখন দেশে মহা আন্দোলন হইয়াছিল। একদিকে সংস্কারপ্রিয় ব্রাহ্মগণ রমাপ্রসাদের এই রক্ষণশীলতা দেখিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, অপরদিকে অতিরক্ষণশীল হিন্দু দলপতিগণ "বিধর্ম্মী" রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদের হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়ায় যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। "নুড়িঘাটা"র [পাথুরিয়া ঘাটার] "* * * [খেলাত] চন্দ্র ঘোষ" প্রভৃতি অতিরক্ষণশীল হিন্দু দলপতিগণ রমাপ্রসাদের মাতৃশ্রাদ্ধে বিঘ্ন ঘটাইবার কিরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র এই বিষয় লইয়া কিরূপ আন্দোলন হইয়াছিল, লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে অবশেষে রমাপ্রসাদ কিরূপে মাতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় "হুতোম প্যাঁচার নক্সায়," লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে, আমাদের কেবল একটি কথা মনে হয় যে রমাপ্রসাদ উপনিষদের ধর্ম্ম গ্রহণের সহিত হিন্দু সমাজের চিরানুসৃত আচারাদি পদদলিত না করিয়া কি আমাদের একটি অমূল্য উপদেশ দিয়া যান নাই? তিনি কি শিক্ষিত

হিন্দু-সমাজকে দেখান নাই যে দেশাচার লঙ্ঘন না করিয়াও প্রকৃত ব্রাহ্ম হওয়া যায় এবং ব্রাহ্ম সমাজকে দেখান নাই যে হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? এই ইঙ্গিত ব্রাহ্ম-সমাজ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ আজি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় কলুষিত ও গৃহবিচ্ছেদে ভগ্নবল হইয়াছে। পক্ষান্তরে, হিন্দু সমাজ এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া, রমাপ্রসাদকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া, যে উদারতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারই ফলে আজিও আচারনিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রকৃত ব্রাহ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, শান্ত ও সংযতভাবে যে সংস্কার ধীরে ধীরে সমাজের হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে তাহার ফল বহুকাল স্থায়ী হয়। রমাপ্রসাদ জানিতেন সমাজ ভাঙ্গিলেই সমাজ গঠিত হয় না।

(২) বিধবা বিবাহে রমাপ্রসাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রেও জানিতেন যে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা দ্বারা, বা প্রলোভনের দ্বারা, এতদ্দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা সম্ভবপর নহে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহিত, সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের সহিত, ভবিষ্যতে ইহা প্রচলিত হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উহার

প্রচলন অসম্ভব। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত যে খুব সমীচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেই তাঁহার দূরদর্শিতা জনিত অমুষ্ঠাকে সৎক্রিয়াসাহসের অভাব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তীরও প্রচার আছে। 'সঞ্জীবনীতে' কোনও লেখক একবার লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ হয়। তখন কলিকাতার অনেক বড়লোক, এ বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন। লজ্জায় বিষয় এই যে কেহই উপস্থিত হন নাই। এই বিবাহের পূর্ব্বে তিনি স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন "আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব; বিবাহ স্থলে নাই গেলাম।" এই কথা শুনিয়া ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎ ক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওটা ফেলে দাও।" এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন।"

এতৎ সম্বন্ধে ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি "প্রকৃতি"তে লিখিয়াছিলেন—

"আমায় পিতৃদেব গোপীনাথ রায় চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছিলেন তিনি (রমাপ্রসাদ), বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কহিয়াছিলেন, 'আমার পিতা, সমাজ সংস্কারের কসুর করেন নাই। তাতে তো কোনই ফল ফলে নাই। অতএব আর চেষ্টা পাওয়া বৃথা।" এই বলিয়া বিধবা বিবাহের সভায় যাইতে তিনি অস্বীকৃত হন। বিদ্যাসাগর ও রমাপ্রসাদ বাবুর কথোপকথন সময়ে বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অন্যান্য অনেকেই, উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের নিকটেও এই কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম।"

"সংবাদ প্রভাকরে" প্রথম বিধবা বিবাহের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় যে বিবাহস্থলে রমাপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং 'সঞ্জীবনী'র লেখকের গল্পে আস্থাস্থাপন করা যায় না। বিধবা বিবাহে যে রমাপ্রসাদের সহানুভূতি ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ বিষয়েও রমাপ্রসাদ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপ্রণীত 'বহুবিবাহ' নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "লোকান্তর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন এবং নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে, যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়।"



বিদ্যাসাগর (তরুণ বয়সে

রামমোহন যে পথে গিয়াছিলেন রমাপ্রসাদ সে পথের পথিক হন নাই সত্য। কিন্তু তিনি "প্রাচীন পঙ্কময় ভগ্ন-পথের" পথিক না হইয়া নূতন পথে চলিলে কি সেই ভগ্ন-পথের সংস্কার সাধিত হইত? "ভগ্নপথে"র সংস্কার করিতে গেলে কি সেই পথে থাকিয়াই ধীরে ধীরে তাহার উন্নতি করিতে হইবে না?

পিতার তেজস্বিতার অধিকারী না হইলেও যে রমাপ্রসাদ শক্তিমান স্বদেশহিতৈষী ও বুদ্ধিমান নীরবকর্ম্মী ছিলেন একথা সকলেই জানিতেন। বিদ্যাসাগরের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, "রমাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদে বিদ্যাসাগর অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, শক্তিপূজকের চিরকালই পূজনীয়। বিদ্যাসাগর প্রকৃত শক্তি-সেবী। রমাপ্রসাদ রায়ও প্রকৃত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি রমাপ্রসাদ বাবুর বিয়োগ জন্য দুঃখিত হয়েন।"

রমাপ্রসাদ যে শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন একথা কে অস্বীকার করিবে? কৈশোরেই তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমনের সময় সমাজে সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা ও রাজকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ছিলেন না, কিন্তু তিনি এতগুলি সদ্‌গুণের আধার ছিলেন যে তিনি চিরদিন তাঁহার দেশবাসীর স্মরণীয় থাকিবেন। ১৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত The Company and the Crown নামক সুলিখিত গ্রন্থে লর্ড এলগিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিষ্টার হভেল্‌-থার্লো রমাপ্রসাদের অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যকালে 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সহবাস নিবন্ধন তিনি লোকচরিত্রজ্ঞ, বিনয়ী, সদালাপী ও মিষ্টভাষী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথের সুরুচিরও তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল সকল গুণে এবং অদ্ভুত আতিথেয়তায় বিমুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার সহিত অকৃত্রিম সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অসংখ্য য়ুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুদিগের নামোল্লেখ করা দুঃসাধ্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র, রামলোচন ঘোষ, রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ, রেভারেণ্ড সি, এইচ, এ, ডল, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পিতৃবন্ধু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মাতুল মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্রকে তিনি তাঁহার সম্পত্তির একজিকিউটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রমা-

প্রসাদের অনন্যসাধারণ মনীষা ও মনস্বিতা, অবিচলিত উৎসাহ ও অধ্যবসায়, অপূর্ব্ব পরিশ্রমশীলতা ও কার্য্যদক্ষতা দেশবাসীর গৌরবময় আদর্শ হওয়া উচিত। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, দেশব্রত গিরিশচন্দ্র ঘোষ তৎপ্রবর্ত্তিত ও তৎসম্পাদিত "বেঙ্গলী" পত্রে রমাপ্রসাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদের চরিত্র সমালোচনার উপসংহারে আমরা সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া পুনরায় বলিব:—"He was second to none of his contemporaries in point of genius, sound legal acquirements, sterling commonsense, breadth of view and genuine sympathy for the just rights of the ryots of this Presidency."



আচার্য্য লালবিহারী দে

আচার্য্য লালবিহারী দে

উপক্রমণিকা। আলেকজাণ্ডার ডফ্ প্রভৃতি প্রথিতনামা খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রাণপণ প্রযত্ন ও প্রচেষ্টায় যে সকল বঙ্গসন্তান হিন্দুসমাজের শান্তিময় ক্রোড় হইতে চিরবিচ্যুত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও গভীর স্বদেশানুরাগের জন্য বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র এবং চিরস্মরণীয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক "ভয়াবহ পরধর্ম্ম" অবলম্বন করেন, তাঁহারা ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহের সহিত স্বদেশ ও স্বজাতির সহিত সম্বন্ধও পরিত্যাগ করেন। প্রিয়তম পরিজনগণ, শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্বর্গ ও হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়দলের প্রীতি, স্নেহ ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া সমাজের নিকট হইতে বহুবিধ নিগ্রহ ভোগ করিয়া, তাঁহারা কালাপাহাড়ের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতির উপর প্রতিহিংসা গ্রহণে সমুৎসুক হন। বিশেষতঃ আমাদিগের এই হিন্দুর দেশে, যে দেশে ধর্ম্মের জন্য স্নেহময় পিতা প্রিয়তম পুত্রের সহিত, প্রেমময়ী ভার্য্যা জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর সহিত, প্রীতিসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে



রেভারেণ্ড: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কুণ্ঠিত নহেন—সেই দশে, ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহী তাকে কি প্রকার মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই সকল দুর্লভ স্নেহ সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, স্বজাতীয় সমাজকর্তৃক নিগৃহীত হইয়াও, স্বদেশের ও সজাতির উন্নতিকল্পে যাঁহারা যত্নবান হন তাঁহারা দেশবাসীর প্রীতি ও সহানুভূতি হইতে একেবারে বঞ্চিত হন না। এইজন্যই যে সকল বঙ্গসন্তান বিদেশীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিলেও স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, বিদেশীয় সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াও সজাতিকে ভুলিতে পারেন নাই, তাঁহারা প্রথমে হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলেও শেষে বঙ্গদেশীয় জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যিনি দেশোন্নতিবিষয়ক সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন, যাঁহার সংস্কৃতাদি সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁহার সমসাময়িকগণের শ্রদ্ধা উদ্রেক করিত, যিনি আবর্জ্জনাপূর্ণ বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতীচ্য-বিদ্যার 'কল্পদ্রুম' রোপণ করিয়াছিলেন, সেই স্বদেশহিত-চিকীর্ষু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিন বঙ্গবাসীর বন্দনীয় থাকিবেন। সুদূর ইংলণ্ডে অবস্থান কালেও জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের কথা সতত যাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত, ইংরাজী সাহিত্যসম্পদসম্ভারের সন্ধান পাইয়াও



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যাঁহার দৃষ্টি বঙ্গভাণ্ডারের 'বিবিধ রত্নে'র প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং "কালে,—মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণি-জালে" আবিষ্কার করিতে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছিল, বিদেশীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিলেও বঙ্গবাণীর সেই বরপুত্র মধুসূদনের স্মৃতি চিরদিন "যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে।" যাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ ও দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার-কল্পে আগ্রহপূর্ণ চেষ্টা তাঁহার জীবনের প্রতি অঙ্কে পরিদৃষ্ট হইত, বাঙ্গালার সেই অনন্যসাধারণ বাগ্মী, সংলতার প্রতিমূর্ত্তি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিও বহুদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়ে সমুজ্জ্বল থাকিবে। প্রগাঢ় সাহিত্যপ্রেম ও অক্লান্ত সাহিত্যসেবা রামবাগানের খৃষ্টান দত্তপরিবার-কেও বঙ্গবাসীর স্মৃতিপট হইতে অপসৃত হইতে দিবে না। বিশেষতঃ, স্যর এডমণ্ড গস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ যাঁহাদিগের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুক্তকণ্ঠে উচ্চপ্রশংসাবাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন, সেই "কলারাজ্যে দুটী রাণী, প্রতিভার বুঝি যমক কন্যা রমা আর বীণাপাণি" —কুমারী তরু ও অরুর নাম বঙ্গবাসী চিরদিন গৌরব-মিশ্রিত আনন্দ ও অপূর্ণ আশার তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের সহিত স্মরণ করিবেন। যে প্রতিভাশালী বাঙ্গালীর জীবন-কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, সেই চির-দরিদ্র বাঙ্গালী



রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মধ্যবয়সে)

কৃষকের সমবেদনা-উচ্ছ্বসিত-জীবনেতিহাস-রচয়িতা, বাঙ্গালী শিশুর শয়ন-মন্দির-মুখরিত বঙ্গলক্ষ্মীর স্নেহ-সিঞ্চিত অমৃত-কথার সুনিপুণ লিপিকর, বাঙ্গালা সাহিত্য সংস্কারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্গসাহিত্যের সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক, বাঙ্গালায় প্রতীচ্য শিক্ষাবিস্তারের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী, মনীষার বরপুত্র লালবিহারী দের স্মৃতিও চিরদিন বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক সসম্মানে পূজিত হইবে।

জন্ম। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত তালপুর গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে লালবিহারী জন্মগ্রহণ করেন। আমাদিগের দেশে আত্ম-চরিত লিখনের রীতি প্রচলিত না থাকায় কাহারও বাল্যজীবনের ইতিহাস সঙ্কলন সচরাচর দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। লালবিহারীর জীবনী লেখক এ বিষয়ে সৌভাগ্যবান। কারণ তৎসম্পাদিত "বেঙ্গল ম্যাগেজিন" পত্রিকায় প্রকাশিত "Recollections of my School Days" বা 'ছাত্রজীবনের স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে এবং তদ্বিরচিত "Recollections of Alexander Duff" বা 'ডফস্মৃতি' নামক গ্রন্থে, লালবিহারী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বর্ণনাশক্তির প্রয়োগে তাঁহার বাল্যজীবনের এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

লালবিহারীর পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন; কলি-

কাতায় সামান্য দালালের কার্য্যকরিয়া কোনও প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার পরিবারবর্গ তালপুরেই অবস্থান করিতেন। শারদীয়া পূজার সময়, বৎসরে একমাসের জন্য মাত্র লালবিহারীর পিতা পরিবার-বর্গের সহিত সম্মিলিত হইতেন। তিনি মহা বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন—জন্মে কখনও মৎস্য মাংস আহার করেন নাই এবং প্রাতঃস্নানের পর প্রায় একঘণ্টাকাল তুলসীপূজা ও মালাজপ প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত করিতেন ও রাত্রিকালে প্রায় তিনঘণ্টাকাল মালা জপ করিতেন। অহোরাত্রি তাঁহার মুখে হরিনাম উচ্চারিত হইত।

প্রাথমিক শিক্ষা। যখন লালবিহারীর বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর তখন তাঁহার পিতা দেশে আসিয়া কিছু অধিককাল অবস্থান করেন। কারণ, তিনি তাঁহার পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে লালবিহারীর পিতা অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ না করিয়া কোনও বড় কাজ আরম্ভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ

করিবার পূর্ব্বে জ্যোতির্বিদগণকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে শুভক্ষণে পুরোহিত কর্ত্তৃক বাগ্দেবী সরস্বতীর পূজার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। লালবিহারী নববস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দেবীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলে পরদিন প্রাতে গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের নিকট নীত হন। তালপাতা কলাপাতা প্রভৃতি যথানিয়মে শেষ করিয়া লালবিহারী ৪ বৎসরের মধ্যেই পাঠশালার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া কাগজে লিখিতে শিখিলেন এবং শুভঙ্করীতেও যথোচিত ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

কলিকাতায় আগমন। লালবিহারী নয় বৎসরে পদার্পণ করিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে প্রায় পত্রে লিখিতে লাগিলেন যে, লালবিহারীকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান না করিলে তিনি উচ্চপদ বা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি স্বয়ং ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত জীবনে উন্নতিলাভে অসমর্থ হইয়াছেন। লালবিহারীর মাতা লেখাপড়া না জানিলেও লালবিহারীর পিতার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি স্নেহাধিক্য বশতঃ পুত্রের বিদেশ গমনে যথেষ্ট আপত্তি করেন। অবশেষে সাধ্বী হিন্দুরমণীর ন্যায় তাঁহাকে স্বামীর মতেই সম্মতি প্রদান করিতে হইল। পুরোহিত ও জ্যোতিষীকে আহ্বান করা হইল। লালবিহারীর কোষ্ঠী বিচার করিয়া শুভদিন শুভক্ষণ নিরূপিত হইল। জ্যোতিষী লালবিহারীর জননীকে কহিলেন, "মা, এই দিন অত্যন্ত শুভ, এরূপ শুভদিন আমি পূর্ব্বে কখনও গণনা করি নাই। আপনার পুত্র অত্যন্ত বিদ্বান ও ধনবান হইবেন।" লালবিহারী লিখিয়াছেন তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বদিন তাঁহার স্নেহশীলা জননী অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, রজনীতে এক মুহূর্ত্তও নয়ন মুদিত করেন নাই, শতবার নিদ্রিত সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে পুরোহিত কর্ত্তৃক যাত্রাকালীন অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইলে লালবিহারী গৃহদেবতা মদনমোহনকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন।

তৃতীয় দিনে লালবিহারী কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তিনি পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।



ডাক্তার ডফ্‌

ইংরাজী শিক্ষা। ডফ্ সাহেবের স্কুলে। তৎকালে কলিকাতায় চারিটি প্রধান ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল,—হিন্দুকলেজ, জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসন, স্কুল সোসাইটিজ্ স্কুল বা হেয়ার স্কুল এবং গৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী। কোন্ বিদ্যালয়ে লালবিহারীকে প্রবিষ্ট করান হইবে তৎসম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত হইতে তাঁহার পিতাকে অধিক চিন্তা করিতে হয় নাই। হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগকে পাঁচ টাকা এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রদিগকে তিন টাকা বেতন দিতে হইত। পুত্রের শিক্ষার জন্য মাসে তিন টাকাও ব্যয় করেন লালবিহারীর পিতার অবস্থা এত সচ্ছল ছিল না। পুত্রকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রবিষ্ট করাইবার পথেও একটি প্রতিবন্ধক ছিল। হেয়ার সাহেব বাছাই করিয়া ছাত্র লইতেন; লালবিহারী নির্ব্বাচিত হইবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। সুতরাং ডফ্ কর্ত্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনেই লালবিহারীকে প্রবিষ্ট করান স্থির হইল। তখন "ফিরিঙ্গি কমল বসু"র বাটীতে সংস্থাপিত ডফ্ সাহেবের স্কুলে ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না এবং অধ্যাপনাও অতি সুন্দর হইত। ডফ্ সাহেব গোঁড়া

খৃষ্টান ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তিনি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দুই বৎসরও হয় নাই ব্রাহ্মণসন্তান কৃষ্ণমোহনকে ডাক্তার ডফ্ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লালবিহারীকে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে প্রবিষ্ট করাইবার সময় তাঁহার পিতার বন্ধুগণ তাহাকে এই কার্য্য করিতে বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন। লালবিহারীর পিতা অধিকাংশ হিন্দুর ন্যায় অদৃষ্টবাদী ছিলেন, এবং উত্তরে বলেন, "যদি কালাগোপালের (লালবিহারীর হিন্দুনাম) কপালে লেখা থাকে যে, সে খৃষ্টান হইবে না, ডফ্ সাহেবের সহস্র চেষ্টাও নিষ্ফল হইবে; আর যদি ইহা লেখা থাকে যে, সে খ্রীষ্টান হইবে, তবে আমার সাধ্য কি তাহার অন্যথা করি?"

লালবিহারী দ্বাদশবর্ষকাল জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে অধ্যয়ন করেন। ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার ম্যাকে, ডাক্তার ইউয়ার্ট, মিষ্টার জন ম্যাকডোনাল্ড ও ডাক্তার টমাস স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের উপদেশে লালবিহারী যৎপরোনাস্তি উপকৃত হন। তিনি প্রায় সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন এবং শেষ তিনবৎসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবর্ণ পদক লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রজীবনের

অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বঙ্গদেশের সকল ছাত্রের অনুকরণীয়। দরিদ্র লালবিহারী প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে পারিতেন না। কোনকালে পাটীগণিত বা বীজগণিতের কোন পুস্তক তাঁহার ছিল না, তিনি বিদ্যালয়েই অঙ্ক শিক্ষা করিতেন। তাঁহার কোনও শিক্ষক কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে একখানি জ্যামিতি পুস্তক ধার দিয়াছিলেন। উচ্চগণিতের পুস্তকাদি লালবিহারী সহপাঠীদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া স্বহস্তে নকল করিয়া লইতেন। ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞান লাভের জন্য লালবিহারী একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কয়েক আনা পয়সা দিয়া তিনি এক ফিরিওয়ালার নিকট হইতে একখানি অসম্পূর্ণ ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান ক্রয় করিয়াছিলেন। উহাতে আদ্যাক্ষর "A" মোটেই ছিল না। এই অভিধানের সাহায্যে তিনি ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করেন। এই পুস্তক-বিক্রেতার নিকট হইতে কয়েকটী পয়সা দিয়া তিনি হিউমের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসের একখণ্ড ক্রয় করেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তিনি আবার উহার পরিবর্ত্তে বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখক এডিসনের 'স্পেক্টেটর' একখণ্ড গ্রহণ করেন ও পরে সেখানি পাঠ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আর একখানি পুস্তকের একখণ্ড গ্রহণ করেন। এইরূপে আর এক কপর্দ্দকও ব্যয় না

করিয়া একখানি পুস্তকের বিনিময়ে নূতন একখানি পুস্তক গ্রহণ, ও তদ্বিনিময়ে অপর একখানি পুস্তক গ্রহণ, এইরূপ উপায়ে লালবিহারী ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের সহিত পরিচয় লাভ করেন। পুস্তকগুলি অসম্পূর্ণ হইলেও জ্ঞানপিপাসু লালবিহারী আগ্রহের সহিত সেগুলি পাঠ করিতেন। পুস্তক-বিক্রেতা বোধ হয় দরিদ্র বালকের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়াই এইরূপ পুস্তক বিনিময়ে সম্মত হইয়াছিল নতুবা সকল গ্রাহক লালবিহারীর মত হইলে তাহার জীবিকানির্ব্বাহ অসম্ভব হইত।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লালবিহারীর পিতৃবিয়োগ ঘটে, এবং লালবিহারী তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতার আশ্রয়ে অতিকষ্টে কাল যাপন করিতে বাধ্য হন। হিন্দু কলেজে অনেকগুলি বহুমূল্য ছাত্রবৃত্তি প্রদত্ত হইত। হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইলে এবং এইরূপ একটি বৃত্তি পাইলে লালবিহারীর কোনও কষ্ট হইত না। কিন্তু হিন্দু কলেজের বেতন প্রদান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। হেয়ার স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ স্কুলের খরচে হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইতেন। লালবিহারী হেয়ার স্কুলে প্রবেশ লাভের জন্য সচেষ্ট হইলেন।

কিন্তু লালবিহারীর চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। খ্রীষ্টীয়-

ধর্ম্ম প্রচারকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের "বাইবেল পড়া ছেলে" হিন্দুছাত্রগণকে নষ্ট করিবে এই আশঙ্কায় হেয়ার সাহেব লালবিহারীকে স্বীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতে দিলেন না। তখন হিন্দু বালকগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারকল্পে হেয়ার সাহেব কিরূপ যত্ন লইতেন এই ব্যাপার হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পাছে হেয়ার স্কুলের কোনও ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরক্ত হয় ও ফলে হিন্দুবালকগণের অভিভাবকগণ তাহাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে পরাঙ্মুখ হন সেই জন্য খৃষ্টান ডেভিড্ হেয়ারের এই অখৃষ্টানোচিত ব্যবহার যে তাঁহার মহত্ত্বের ও ভারতপ্রীতির কতদূর পরিচয় প্রদান করে তাহা আর বলা নিষ্প্রয়োজন। লালবিহারী হেয়ার "সাহেবের" সহিত সাক্ষাৎ করিলে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

"মহাশয়, আমার ইচ্ছা আমি আপনার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি।"

"তুমি কোন্ বিদ্যালয়ে পড়?"

"আমি এক্ষণে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিসনে পড়িতেছি।



ডেভিড্ হেয়ার

"তুমি কি কি পুস্তক পড়িতেছ ?"

"আমি মার্শম্যানের ইতিহাস লেনীর ইংরাজী ব্যাকরণ, ভুগোল, জ্যামিতি (২য় খণ্ড), বাইবেল এবং বাঙ্গলা পড়িতেছি।"

"তুমি জ্যামিতির সপ্তম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে পার ? বোর্ডে গিয়া বুঝাইয়া দাও দেখি ?"

(লালবিহারী প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণ করিলে হেয়ার সাহেবের সহিত পুনরায় কথোপকথন হইল।)

"তুমি বেশ শিক্ষালাভ করিতেছ দেখিতেছি ; তুমি কেন জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটীউসন হইতে চলিয়া আসিতে চাহ ?"

"লোকে বলে আপনার বিদ্যালয়ে আরও ভাল পড়া হয়, বিশেষতঃ, আমি আপনার স্কুল হইতে হিন্দুকলেজে যাইবার বাসনা করি।"

"জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে নিশ্চয়ই খুব ভাল পড়া হয়, ডাক্তার ডফ মিষ্টার ক্যাম্বেল নামক একজন নূতন ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছেন।"

"জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টীটিউসনে ক্যাম্বেল নামে কেহ নাই, বোধ হয় আপনি মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ডের কথা বলিতেছেন ?"

"হাঁ, হাঁ, মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড, সকলে বলে তিনি বেশ বিচক্ষণ লোক। আচ্ছা তুমি যে বিদ্যালয়ে পড়িতেছ সেই খানেই থাক।"

"না মহাশয়; অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে আপনার স্কুলে লউন।"

"তুমি বাইবেল পড়—তুমি অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান। তুমি কি আমার ছাত্রদিগকে নষ্ট করিবে?"

আমাদিগের বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক বলিয়াই আমি বাইবেল পড়ি—বাইবেলের ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস নাই। আমি আপনার ছাত্রগণের ন্যায় হিন্দু—খ্রীষ্টান নহি।

"মিষ্টার ডফের সব ছাত্রই অর্দ্ধেক খৃষ্টান। আমি তাহাদিগের কাহাকেও আমার স্কুলে লইব না। আমি তোমাকে লইব না—তুমি অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান—তুমি আমার ছেলেদের খারাপ করিবে।"

লালবিহারী অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ডেভিড হেয়ারের এক উত্তর—"তুমি অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান,—তুমি আমার ছেলেদের খারাপ করিবে।"

অগত্যা লালবিহারীকে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে পাঠ সমাপ্ত করিতে হইল।

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ। উনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে লালবিহারী ডাক্তার ডফ কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। লালবিহারী মধুসূদনের ন্যায় "সাহেব" সাজিবার জন্য খ্রীষ্টান হন নাই বা কৃষ্ণমোহনের ন্যায় হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। ডাক্তার ডফ প্রভৃতির উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া, বাইবেলখানি সযত্নে পাঠ করিয়া, বাইবেলের ধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসলাভ করিয়া লালবিহারী খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই হিন্দু লালবিহারী খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক দুইটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিদ্যালয়স্থ অন্যান্য সমস্ত ছাত্র অপেক্ষা স্বীয় খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞানের আধিক্য প্রতিপন্ন করিয়া দুইটি পুরস্কারও লাভ করিয়াছিলেন। লালবিহারীর হিন্দুধর্ম্মত্যাগকালে তাঁহার স্নেহময়ী মাতৃদেবী জীবিতা ছিলেন। সুতরাং বিবেকানু-যায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিতে লালবিহারীকে কতদূর আত্মত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা নিস্প্রয়োজন। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর গৃহে প্রত্যাগমনের কি করুণ চিত্রই তিনি স্বয়ং অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।—

"When I stood before the door of my own home, to me as familiar as the face of

an old friend, instead of being greeted with rejoicings, I was welcomed with cries and tears. The report of my coming had gone forth before I reached the village, and the whole neighbourhood had come out to greet me. On every side nothing was seen or heard but lamentation, mourning and woe. Scenes like these—scenes created by causes little understood by foreigners on account of their connection with the inner texture of Hindu manners—occur to every native convert, and constitute, after all, his chief privation, and the influence of which is felt by him more than the loss of the wealth of Ormuz, India or the late discovered Eldorado of California."

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী মিষ্টার ডফের গির্জ্জায় ক্যাটেকিষ্ট নিযুক্ত হন ও পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মোপদেশকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কালনার গির্জ্জায় পাদরী নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে

ক্রাইস্টচার্চের পাদরী নিযুক্ত হন। কালনায় অবস্থানকালে তাঁহার সাহিত্য-সেবার সুযোগ উপস্থিত হয়। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদির আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। এই সকল বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদি তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিলেও সাহিত্যে স্থায়ী স্থানলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার একটি খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ কিরূপে তাঁহার পারিবারিক জীবনের একটি প্রধান ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

বিবাহ। এতদ্দেশে খৃষ্টধর্ম্মবিস্তারবিষয়ক পুস্তকাদি দেখিয়া লালবিহারী গুজরাটনিবাসী পার্শী খৃষ্টান রেভারেণ্ড হরমাদজি পেষ্টনজি ও তাঁহার বিদুষী কন্যার নামের সহিত পরিচিত হন। পরে হরমাদজির সহিত লালবিহারীর ধর্ম্মবিষয়ক পত্রব্যবহার আরব্ধ হয়। লালবিহারী তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি হরমাদজিকে প্রেরণ করিতেন। কোনও পার্শী বন্ধুর মধ্যস্থতায় লালবিহারীর সহিত হরমাদজির কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপিত হয়। লালবিহারী হরমাদজির কন্যার বিবিধ গুণগ্রাম শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহের প্রস্তাবে কন্যার পিতার কোনও আপত্তি ছিল না। তিনি কন্যার সম্মতি

লাভের জন্য লালবিহারীকে গুজরাটে আহ্বান করেন। অর্থাভাব বশতঃ লালবিহারী তৎকালে সেই দুর্গম প্রদেশে যাইতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর পরে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া তিনি তথায় যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া হরমাদজির নিকট পত্র লেখেন। কিন্তু তখন সিপাহী বিদ্রোহের গোলমালে পত্রখানি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায় নাই। এদিকে হরমাদজির নিকট হইতে পত্রের উত্তর না পাইয়া লালবিহারী স্থির করিলেন যে, ইতিমধ্যে তাঁহার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উভয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার বন্ধ হইল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লালবিহারী Searchings of the Heart নামে একটি ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রকাশিত করেন। কিছুকাল পরে উহার একখণ্ড হরমাদজিকে প্রেরণ করেন। হরমাদজি উহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া পত্র লিখেন এবং লালবিহারী এতদিন কেন তাঁহাকে পত্র লিখেন নাই তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। ক্রমে লালবিহারী জানিতে পারিলেন যে, পত্রের গোলমালে তিনি হারমাদজির সম্বাদ পান নাই এবং তাঁহার বিদুষী কন্যা তখনও অবিবাহিতা আছেন। অতঃপর লালবিহারী কালবিলম্ব না করিয়া কুমারী হরমাদজীর সহিত আলাপ করেন এবং

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর প্রদেশের অন্তর্গত গোগো নগরে তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। লালবিহারীর পত্নী সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার যোগ্যা এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী ছিলেন। স্বামীর সকল সৎকার্য্যে তিনি তাঁহার সাহায্য-কারিণী ছিলেন।

কালনায় অবস্থান কালে লালবিহারী 'অরুণোদয়' নামে একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সম্পাদকতায় উহা তৎকালে অল্প সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই।

ইংরাজী সাহিত্যের সেবা। ইংরাজী সাহিত্যের চর্চ্চা ও সাহিত্যসেবার দিকে লালবিহারীর প্রথমাবধিই একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। অধুনা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব ও ইংরাজী সাহিত্যসেবা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে আপনাদিগের সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু অনেকের মুখে এরূপ শুনা যায় যে, এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মাতৃভাষার সেবা না করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের সেবা করিয়া বিষম

ভুল করিয়াছিলেন। আমরা এরূপ মন্তব্যের সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতে অসমর্থ। বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ মাতৃভাষায় "সন্ন্যাসী" শব্দ লিখিতে বানান ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা হাসিতে পারি, কিন্তু জাতীয় জীবনের সেই যুগ-পরিবর্ত্তন-কালে যাঁহার ওজস্বিনী ইংরাজী বক্তৃতা ও অকাট্যযুক্তিপূর্ণ ইংরাজী প্রবন্ধাদি রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ দৃঢ় করিয়াছিল, প্রজার অভাব ও অভিযোগ রাজার নিকট উপস্থাপিত করিয়া সে সকলের প্রতীকারের উপায় করিয়া দিয়াছিল, তাঁহার ইংরাজী সাহিত্যচর্চ্চা কখনই নিন্দনীয় হইতে পারে না। 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র, 'রেইস এণ্ড রায়ত' সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজনীতিবিশারদ কৃষ্ণদাস পাল, সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীরা ইংরাজীভাষাজ্ঞানের দ্বারা দেশের কত উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যাঁহারা তাহা অবগত আছেন তাঁহারা কখনই তাঁহাদিগের ইংরাজী সাহিত্য চর্চ্চা নিষ্প্রয়োজন ছিল বলিবেন না। এখনও ইংরাজীতে অভিজ্ঞ জননায়ক না থাকিলে

আমাদিগের চলে না। বাস্তবিক ইংরাজী আমাদিগের রাজভাষা বলিয়া উহার চর্চ্চা আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

লালবিহারী অল্প বয়স হইতেই ইংরাজী প্রবন্ধাদি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

কলিকাতা রিভিউ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে স্যর জন কে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সুবিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। প্রথম ত্রিশ বৎসর কাল উহা যেরূপ অসাধারণ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল এদেশের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার সম্মিলনের উপর 'কলিকাতা রিভিউয়ের' প্রতিষ্ঠা। স্যর জন কে, ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্, স্যর হেনরী লরেন্স, কর্ণেল ম্যালিসন প্রভৃতির সহিত 'কলিকাতা রিভিউয়ের' প্রবন্ধলেখক বলিয়া যে সকল শিক্ষিত বঙ্গবাসী উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রামবাগানের দত্তগণ উল্লেখযোগ্য।

লালবিহারীর শিক্ষাগুরু রেভারেণ্ড ডাক্তার টমাস

।স্বথের সম্পাদনকালেই লালবিহারী 'কলিকাতা রিভিউয়ের' নিয়মিত লেখক হন এবং ১৮৫১২ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। যথা—

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে—"চৈতন্য এবং বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ।"

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে—"বাঙ্গালীর ক্রীড়া কৌতুক।"

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে—"বাঙ্গালীর পর্ব্বদিন।"

চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে লালবিহারী লিখিয়াছেন :—

"The system of Chaitanya is an important innovation on Hinduism. It is interesting to contemplate, as an index of the march of religious ideas. It contains the germs of certain religious truths. There is a tendency in it to universal diffusion. This is an important idea in religion. It was lost sight of by the ancient religionists of India. Like the esoteric

and exoteric doctrines of the Greek philosophers, the Hindus had, and still have, one religion for the lettered few, and another for the ignorant many. The Gyan Kanda contains the theology of intellectual men, and the Karma Kanda that of the illiterate multitude. The transcendental theosophy of the priestly class is quite different from the mythical religion of the people. This want of a fellowship in religious interest between men of culture and the unthinking multitude is repudiated by Chaitanya. His system encourages no monopoly of religious knowledge. It places the same doctrines before learned and unlearned men. It has no mysteries into which all its votaries may not be initiated. Its simplicity is another important peculiarity. This, too is a move in the right direction. Unlike the metaphysical abstractions, refined subtleties, and hair-

splitting distinctions of the Vedanta, all which pre-eminently unfit it to be the religion of a whole nation, the doctrines of Chaitanya are simple and level to the comprehension of the meanest capacity. Unlike, too, the multitudinous rites and ceremonies prescribed in the Hindu rituals, it proclaims the omnipotence of one principle, and the vast efficacy of one religious duty. In insisting on Bhakti, as a *Sine qua non* of personal religions, it has made a faint approximation to faith, that prolific principle of the Christian revelation. It has brought out a new element in the natural history, so to speak, of religious feeling, In opposition to the cold, intellectual and abstract idea of religion, which the Vedanta proposes, and the totally external view, which the popular superstition gives of it, Chaitanya lays much stress on the affections and sen-

sibilities as constituting a great part of religion. We say not that the aspect, in which the system under review regards religion, is not external; for, that much of it is so in a very gross sense, will be evident from what we have already written. But yet it is delightful to observe that the heart, with its affections and feelings, has not been entirely thrown aside. We regard the system of Chaitanya as an interesting development of the religious consciousness of India. It is a sign of the times, and an index of the march of liberal ideas in religion."

বাঙ্গালীর 'ক্রীড়া কৌতুক' প্রবন্ধে বাঙ্গালীর বিবিধ প্রকার ক্রীড়াকৌতুকের মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

'বাঙ্গালীর পর্ব্বদিন' শীর্ষক প্রবন্ধে বিবিধ পর্ব্বোৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রবন্ধের শেষভাগে লাল-বিহারী লিখিয়াছিলেন যে, যখন এই সকল উৎসবে নানা প্রকার কুৎসিত আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়, তখন এই

সকল পর্ব্বদিনে আফিসের ছুটী বন্ধ করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান অগ্রাহ্য করা সরকারের উচিত। কেরাণীকুলের সৌভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।

বেথুন সভা। কেবল সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াই লালবিহারী যশস্বী হন নাই। তিনি তাৎকালীন বহু সাহিত্যসভার সহিত প্রধান সভ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সকল সভার মধ্যে বেথুন সভার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে মেডিক্যাল কলেজের তাৎকালীন সম্পাদক ডাক্তার এফ্ জে, মৌএট মহোদয়ের চেষ্টায় শিক্ষা কৌন্সিলের সভাপতি চিরস্মরণীয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মরণার্থ এই সাহিত্যসভা সংস্থাপিত হয়। লালবিহারী এই সভায় বহু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন। নিম্নে কয়েকটী প্রধান প্রবন্ধের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইল।

(১) Vernacular Education in Bengal (বঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা)—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পঠিত।

(২) English Education in Bengal (বঙ্গে ইংরাজীভাষা শিক্ষা)—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে পঠিত।

(৩) Primary Education in Bengal (বঙ্গে

প্রাথমিক শিক্ষা)—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর দিবসে পঠিত।

(৪) Teaching of English Literature in the Celleges of Bengal—(বঙ্গদেশীয় কলেজ সমূহে ইংরাজী-সাহিত্য-শিক্ষার প্রণালী) ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ পঠিত।

(৫) All about the Parsis (পার্শীদিগের বিবরণ) —১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মার্চ্চ পঠিত।

(৬) The Rev, John Wilson পাদরী জন উইলসনের জীবন কথা—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারি দিবসে পঠিত।

এতদ্ব্যতীত ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সভায় তাৎকালীন সভাপতি ডাক্তার ডফের ভারতত্যাগ কালে সভার যে বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল লালবিহারী তাহাতেও যে সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। উপরিলিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক প্রবন্ধটি বেথুন সোসাইটীর কার্য্য বিবরণীতে এবং পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি লালবিহারী যে সম্পাদিত "বেঙ্গল ম্যাগে-

ঞ্জিন" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে।

সমাজ-বিজ্ঞান সভা। কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের প্রস্তাবানুসারে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় Bengal Social Science Association বা বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞানসভা প্রতিষ্ঠিত হইলে লালবিহারী এই সভার সভ্য হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১২শে জানুয়ারি দিবসে এই সভায় তিনি Compulsory Education in Bengal শীর্ষক একটি মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রস্তাব করেন যে যেহেতু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে দরিদ্র সন্তানগণের শিক্ষার তাদৃশ ব্যবস্থা নাই আমাদের উচিত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা যে দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পিতামাতাকে তাহাদিগের পুত্রসন্তানগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হউক—

"We have therefore, no other alternative than to have recourse to the system of compulsory education, and to request the Govt, to establish schools throughout the country and to compel every parent to send his male children

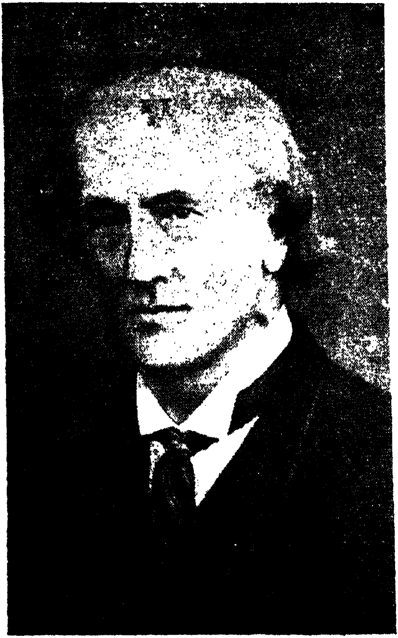
to them for instruction. I say male children, for, unfortunately, so dense is the ignorance of the people that an order compelling every girl to be educated would meet with the most violent opposition. But it is some consolation to remember that, when all the boys of the country are educated, the education of girls will not be long delayed.

এই প্রবন্ধ পাঠের পর রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ, বাবু কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শ্যামাচরণ সরকার, মিষ্টার মতিলাল মিত্র, ডাক্তার সূর্য্য গুডিব চক্রবর্ত্তী, বাবু মহেন্দ্রলাল ঘোষ, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, মিষ্টার এইচ উড্রো এবং মিষ্টার ডব্লিউ এস্ এটকিন্সন বহুক্ষণ এই প্রবন্ধের আলোচনা করেন।

"ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার।" বোধ হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী Indian Reformer (ভারত সংস্কারক) নামক একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে সমাজ সংস্কার বিষয়ক বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। দুঃখের বিষয় ইহা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই।

'ফ্রাইডে রিভিউ।' ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী 'Friday Review' নামে আর একখানি সংবাদপত্রের সৃষ্টি করেন। এই পত্রখানি দেশের তাদৃশ উপকার না করিলেও লালবিহারী সাংসারিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতির কারণ হইয়াছিল। সে কথা নিম্নে বলিতেছি।—

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা প্রদেশে যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয় সেরূপ দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশে অতি অল্পই হইয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে এই প্রদেশের অর্দ্ধেক লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর সিসিল বীডনের দীর্ঘসূত্রতার ফলেই এত প্রাণনাশ হইয়াছিল। দেশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বহু সংবাদপত্র বহুদিন হইতে এ বিষয়ে লাট বাহাদুরের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত 'হিন্দুপেট্রিয়ট' এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত "বেঙ্গলী" শত চেষ্টায়ও ছোটলাট বাহাদুরকে যথাসময়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন নাই। দরিদ্র প্রজাগণের চিরবন্ধু পরদুঃখকাতর গিরিশচন্দ্র "বেঙ্গলী"তে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্যর সিসিলের কার্য্যের এইরূপ তীব্র সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন :—



স্তর সিসিল বীডন

"We certainly did not look and hope for large administrative measures from a man of Sir Cecil Beadon's stamp who, to say the most, is a thorough-bred secretary, but as we had our doubts whether a good secretary ever made a good administrator, we were not very sanguine in our expectations when his nomination to the post was first announced. As successor to Sir John Peter Grant, we felt assured that the administration of Sir Cecil Beadon would not, and possibly could not, be a very brilliant or successful one, Of this however we felt confident, that, successful or unsuccessful, he would at least strive to keep pace with the times, that in the midst of dangers and difficulties, he would at least show a semblance of earnestness to meet the evil boldly in the face, and that he would not altogether in such critical times, undeserve the confid-

ence of the people as one possessed, if not of vast original resources, at least of that strength of mind, sincerity of purpose and common humanity which will carry him safely across the troubled waters. In this, too, we have been disappointed. Sir Cecil Beadon is not an original or a vigorous administrator and he never will be. He is a clever precis-writer and that is what we shall ever expect him to remain. When the famine will have done its work, when the whole country will have been strewed, with the dead bodies of starved men, women and children, when whole villages will have been depopulated, and entire races will have become extinct, then and not till then will the powers of Sir Cecil Beadon for harrowing narratives and graphic sketches be called into play. In our issue of the 21st ultimo we pointed out that there are now in Calcutta no less than

thirty thousand houseless strangers who wander about in the streets, mothers leaving their infants by the wayside to perish and to be eaten by dogs and jackals, husbands forsaking their dying wives and leaving them to the tender mercies of the adjutants and vultures of the burning ghats, and urged upon Govt. the necessity of taking immediate steps for the erection of temporary houses of refuge, not with an eye to the health and comfort only of the famished people who have come from the famine districts, but to the health of the native population of Calcutta at whom epidemic diseases are already staring in the face. Calcutta was never in so great a danger as at the present moment. And yet, dead to all feelings of humanity, heedless of the calls of duty, the Lieutenant Governor leaves us most unceremoniously to take

care of ourselves and of the swarming pauper population that have crept into our city in the best way we can, for a luxurious and comfortable retreat in the hills, isolated from the cares of the Government entrusted to his charge. If ill health really be his plea, why not act boldly and independently by resigning at once the reins of administration in favor of some one who may be both willing and able to do his duty." *

বাস্তবিকই দেশের এই ভীষণ অবস্থা ব্রিটিশ পার্লিয়া- মেন্টেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল, এবং পার্লিয়ামেন্ট ভারত গবর্মেণ্টের কৈফিয়ত চাহিয়াছিলেন। ভারত

* "মৎসম্পাদিত Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee" নামক গ্রন্থে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ বিষয়ক আরও কয়েকটি এইরূপ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট কমিশন নিযুক্ত করিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কমিশনের রিপোর্ট পাইয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের উপর তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে কেবলমাত্র কমিশনর এবং বোর্ড অব্ রেভিনিউই তিরস্কৃত হন নাই, এরূপ মহাসঙ্কট সময়ে ছোটলাট বাহাদুরও এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। বড়লাট বাহাদুর লিখিয়াছিলেন, "We find ourselves unable to speak with satisfaction or approval of the mode in which the emergency was met by the Lieutenant Governor"

বিলাতে হাউস অব কমন্স সভায় স্যর সিসিলের কার্য্য তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ স্যর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বক্তৃতার উপসংহারে বলেন, "This catastrophe must always remain a monument of our failure, a humiliation to the people of the country, to the Government, of this country and to those of our Indian officials of whom we had been perhaps a little proud."*

যখন সমস্ত দেশ ছোটলাট বাহাদুরের কার্য্যে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিল, সেই সময়ে লালবিহারী দে তাঁহার Friday Review পত্রে স্যর সিসিলের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহাতে লালবিহারী তদানীন্তন বঙ্গসমাজের বিরক্তিভাজনও হইয়াছিলেন।

শিক্ষাবিভাগে প্রবেশলাভ। সে যাহা হউক, স্যর সিসিল বীডন তাঁহার পক্ষসমর্থক লালবিহারীকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিলেন। তিনি শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট সুপারিষ করাতে লালবিহারী বহরমপুর কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য লালবিহারীর অসাধারণ আগ্রহ ছিল এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল; এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অপূর্ব্ব সুযোগ ঘটিল।

বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী "বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা" নামক একটী প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধটী বেথুন সভায় পঠিত হইয়াছিল। পুস্তিকাখানি ভারতবর্ষের তাৎকালীন রাজপ্রতিনিধি স্যর জন লরেন্সের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

কারণ স্যর জন লরেন্স এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন এবং বেথুন সভার যে অধিবেশনে লালবিহারীর প্রবন্ধ পঠিত হয় সেই অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রবন্ধ-পাঠককে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে লালবিহারী এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় জমিদারগণকে তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে তিনি যে অকাট্য যুক্তি ও চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজন প্রশংসিত হইয়াছিল।

গোবিন্দ সামন্ত বা বঙ্গীয়কৃষকের জীবন-ইতিহাস। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের উত্তর পাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার স্বনামধন্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গালার শ্রমজীবিগণের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন" সম্বন্ধে বাঙ্গালা বা ইংরাজী ভাষায় রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। লালবিহারী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। কিন্তু দুইজন পরীক্ষক ইংলণ্ডে গমন করায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রেরিত প্রবন্ধগুলি পরীক্ষিত হয় নাই। ঐ বৎসরের মধ্যভাগে লালবিহারীর

প্রবন্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় এবং লালবিহারীকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদত্ত হয়। লালবিহারী এই প্রবন্ধে আরও তিনটি অধ্যায় সংযুক্ত করিয়া 'গোবিন্দ সামন্ত' নামে উপন্যাসাকারে প্রকাশিত করেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথ, হাইকোর্টের তদানীন্তন অন্যতম বিচারপতি মাননীয় জে, বি, ফিয়ার এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত আচার্য্য ই, বি, কাউএল মহোদয়গণ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংশোধনে সাহায্য করিয়াছিলেন। পুস্তকখানি পুরস্কার প্রদাতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে উৎসৃষ্ট হয়। এই পুস্তকখানি পরে Bengal Peasant Life বা বঙ্গীয় কৃষকের জীবনেতিহাস নামে সুপরিচিত হয়। এই পুস্তকের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং বোধ হয় আর কোন বাঙ্গালীর ইংরাজী মৌলিক রচনায় এরূপ আদর হয় নাই।" এই পুস্তকখানি কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বজন প্রশংসিত হইয়াছিল এবং অনন্য-সাধারণ প্রতিভার অধিকারী জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চার্লস্ ডারউইন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুস্তকের ইংরাজ প্রকাশকগণকে স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিতে সকল বাঙ্গালীই গৌরব অনুভব করিবেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—



আচার্য্য ই, বি, কাউএল

"I see that the Rev. Lal Behari Day is Editor of the 'Bengal Magazine' and I shall be glad if you would tell him, with my compliments, how much pleasure and instruction I derived from reading a few years ago, his novel, Govinda Samanta."

বস্তুতঃ দরিদ্র বাঙ্গালী কৃষকের ঘরের কথা সহানুভূতি-পূর্ণ হৃদয় লইয়া আর কেহই এরূপ সুন্দরভাবে বিবৃত করিতে সমর্থ হন নাই।

ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে শ্রীযুক্ত সত্যবাদী ঘোষাল এই পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

পদোন্নতি। বহরমপুর হইতে লালবিহারী হুগলী কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকরূপে স্থানান্তরিত হন। গুণগ্রাহী লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল লালবিহারীকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার Bengal Peasant Lifeএ তিনি যে অপূর্ব্ব রচনাক্ষমতা এবং ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই তাঁহার শিক্ষাবিভাগে পদোন্নতির কারণ।

বেঙ্গল ম্যাগেজিন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে লালবিহারী Bengal Magazine নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। ইহার পূর্ব্বে যে শিক্ষিত দেশবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরাজী মাসিকপত্র প্রবর্ত্তিত হয় নাই এমন নহে, কিন্তু কোনও পত্রই অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। রামগোপাল ঘোষের জীবনচরিত প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গ্রন্থের প্রণেতা সুলেখক কৈলাসচন্দ্র বসু তাঁহার সতীর্থ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে Literary Chronicle নামে যে মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন তাহা কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস পাল ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ছাত্রাবস্থায় পরিচালিত Calcutta Monthly Magazineএর তিন সংখ্যার অধিক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কৃতবিদ্য বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত Calcutta Monthly Review বোধ হয় পাঁচ সংখ্যার অধিক প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজী লেখকগণের সহায়তায় Mookerjee's



শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

Magazine নামে যে সুন্দর মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন তাহাও পাঁচ সংখ্যা বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে শম্ভুচন্দ্র নব পর্য্যায়ে Mookerjee's Magazine বাহির করিলে আগষ্ট মাসে লালবিহারী তাঁহার Bengal Magazine বাহির করেন। 'বেঙ্গল ম্যাগেজিন' মুখার্জ্জীর ম্যাগেজিনের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ না করিলেও উহার অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইয়াছিল। তৎকালে দেশবাসিগণের মধ্যে ইংরাজী মাসিক পত্রের পাঠক সংখ্যা অল্প থাকায় এ সকল অনুষ্ঠানে লাভের কোনই সম্ভাবনা থাকিত না, বরঞ্চ পরিচালকগণের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকিত। বেঙ্গল ম্যাগেজিনে উৎকৃষ্ট লেখকের এবং সুপাঠ্য প্রবন্ধের অভাব ছিল না। মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'চৈতন্যের জীবনকথা' এবং 'প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত', নবাগত সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ও 'বঙ্গীয় কৃষককুলের অবস্থা', রমেশচন্দ্রের সহোদর যোগেশচন্দ্র দত্তের 'কাশ্মীরের ইতিহাস', কুমারী তরু ও অরু দত্তের কবিতা, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং সর্ব্বোপরি সম্পাদকের মনোহর সন্দর্ভাদি বেঙ্গল ম্যাগেজিনের



৺রমেশচন্দ্র দত্ত, সি-আই-ই

পত্রগুলি অলঙ্কৃত করিয়াছিল। লালবিহারীর কয়েকটী প্রবন্ধের নাম এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল।

১। The late Babu Kissory Chand Mittra —মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্রের সুন্দর চরিত্র চিত্র।

২। Recollections of my Schooldays—লালবিহারীর ছাত্রজীবনের স্মৃতি-কথা—অতি সুন্দর।

(৩) Teaching of English Literature in the Colleges of Bengal—এই প্রবন্ধটি বেথুনসভায় পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে তাৎকালীন শিক্ষা-প্রদান-প্রণালীর বিবিধ দোষ আলোচিত হয়।

(৪) All about the Parsis—ইহাও বেথুনসভায় পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে পার্শীগণের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(৫) Life and Labors of Dr. Carey—চিরস্মরণীয় উইলিয়ম কেরীর সুন্দর জীবন চরিত। ইহা মিশনারি প্রার্থনা-সমাজে পঠিত হইয়াছিল এবং মার্শম্যানের কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের বিখ্যাত জীবনচরিত প্রকাশের বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

(৬) The Rev. John Wilson—সুলিখিত চরিত-কথা। এই প্রবন্ধও বেথুনসভায় পঠিত হইয়াছিল।

(৭) Folk Tales of Bengal—এই বাঙ্গালা উপকথাগুলি পরে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা।

এতদ্ব্যতীত লালবিহারী 'বেঙ্গল ম্যাগেজিনে' রীতিমত বাঙ্গালা পুস্তকের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি স্থনীতি ও সুরুচি সঙ্গত পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি 'কলিকাতা ঐতিহাসিক সমিতি' (Calcutta Historical Society) কর্তৃক প্রকাশিত 'Bengal Past and Present' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাবলীর একস্থানে লিখিত আছে যে লালবিহারী তাঁহার 'বিষবৃক্ষে'র অতি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা ঐ সমালোচনা পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এই অনুযোগের সমর্থন করিতে পারি না। লালবিহারী স্বীকার করিয়াছেন যে, "Babu Bankim Chandra Chatterjee is not only the most considerable but decidedly the best of the Bengalee novelists," কিন্তু গল্পাংশে যে অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ করা হইয়াছে এবং নির্দোষী



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কুন্দের উপর গ্রন্থকার যে অবিচার করিয়াছেন (Poetical Justice করেন নাই) তজ্জন্য গ্রন্থখানি যে নির্দোষ হয় নাই তাহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে লালবিহারী বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা করিতেন। শুনা যায়, তিনি 'রিভিউয়ে' দীনবন্ধুর পুস্তকের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন এবং তাহাই নাকি দীনবন্ধুর তোঁতারাম ভাট চরিত্রাঙ্কণের কারণ। কিন্তু দীনবন্ধু তদীয় 'সুরধুনী কাব্যে' লালবিহারীর প্রতিভার প্রশংসা করিতে ক্রটি করেন নাই।

ডফ-স্মৃতি। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী Recollections of Alexander Duff বা 'ডফস্মৃতি' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি তাঁহার ছাত্র জীবনের স্মৃতিকথা অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বাঙ্গালার উপকথা। ১৮৮১ লালবিহারী পঞ্জাব গাথার সঙ্কলয়িতা কাপ্তেন রিচার্ড কার্ণ্যাক টেম্পলের উৎসাহে Folk Tales of Bengal নামে বাঙ্গলার উপকথা সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই পুস্তক খানি বোধ হয় লালবিহারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক এবং তাঁহার স্মৃতি চিরদিন বঙ্গদেশে উজ্জ্বল রাখিবে। বাস্তবিক বিদেশীয় ভাষায়

বাঙ্গালী শিশুর শৈশব-স্বপ্ন কথা যে এরূপ সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পারে ইহা অনেকেরই কল্পনারও অতীত। এই পুস্তকখানি সর্ব্বত্র যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ইহার বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইবামাত্র নিঃশেষিত হইয়াছে।

লালবিহারীর পাণ্ডিত্য। লালবিহারী আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি কলেজের উচ্চতম শ্রেণী সমূহে ইংরাজী সাহিত্য ও প্রতীচ্য দর্শন শিক্ষা দিতেন। ঐ বিষয়ে তিনি বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষাজ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক রো এবং ওয়েব্ তাঁহাদিগের পুস্তকে বাঙ্গালীর ইংরাজী রচনায় কতকগুলি ত্রুটির তালিকা করিয়া "বাবু ইংরাজী" (Baboo English) বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন তখন লালবিহারী এই ইংরাজ অধ্যাপকদ্বয়ের ইংরাজীর ভূরি ভূরি দোষ প্রদর্শিত করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মান রক্ষা করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বা সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

শুনা যায়, লালবিহারীর কিছু পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল। ১৩২০ সালের "মানসী"তে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় স্যর গুরুদাসের 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—"Bengal Peasant Life" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লালবিহারী দে এই সময় (১৮৭০।৭১) বহরমপুর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন; Grant Hall Club নামক নবপ্রতিষ্ঠিত সভার তিনি সম্পাদক ও প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহার সহকারী সভাপতি এবং তৎকালীন সবজজ দিগম্বর বিশ্বাস উহার সভাপতি ছিলেন। * * * দিগম্বর বিশ্বাস বদলি হইয়া গেলে, স্যার গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে, সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁহার ধারণা ছিল যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভাল ইংরাজী জানেন এবং প্রেসিডেন্ট পদে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার। * * * ইহার পরে লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে উহা উঠিয়া যায়।" যদি লালবিহারীর পাণ্ডিত্যাভিমানের কথা সত্য হয়, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই; এবং তাঁহার সেই সামান্য দুর্ব্বলতাটুকু আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারি।



স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অবসর গ্রহণ। ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় লালবিহারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতন পাইতেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি পাঁচ বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন।

শেষ জীবন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ দিনগুলি নিরুদ্বেগে যাপিত হয় নাই। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিলাতে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কোনও সম্বাদ না পাইয়া তিনি শান্তিহারা হইয়াছিলেন। তিনি কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করিয়া কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার শেষ জীবনের অশান্তির অন্যতম কারণ। তবে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও কন্যাগণ অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে যথাসম্ভব সুখে রাখিতে চেষ্টা পাইতেন। লালবিহারীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার কন্যাগণ অধিকাংশ সময় তাঁহাকে ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইহাতে তিনি কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতেন।

স্মৃতি-চিহ্ন। তাঁহার মৃত্যুর পর জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইনষ্টিটিউসনে তাঁহার কতিপয় ছাত্র, বন্ধু ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে—

IN MEMORY OF

THE REV. LAL BEHARI DEY.

A Student of the General Assembly's Institution under Dr. Duff, 1834 to 1844; Missionary and Minister of the Free Church of Scotland, 1855 to 1867; Professor of English Literature in the Government College at Berhampore and Hooghly, 1867 to 1889: Fellow of the University of Calcutta from 1877, and well known as a journalist and as author of BENGAL PEASANT LIFE and other works. Born at Talpur Burdwan, 18th December 1824; died at Calcutta, 28th October 1894.

উপসংহার। অমর কবি দীনবন্ধু তাঁহার "সুরধুনী কাব্যে" লালবিহারীর এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন :—

বিনোদ-বাসনা লালবিহারী ধীমান্
সরল-স্বভাব ধীর গভীর-বিজ্ঞান,
অবাধে লেখনী চলে, ভাষা মনোহর,
মধুর বচনে তুষ্ট মানব নিকর,
খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বী ধর্ম্ম সুধাপান
অভিলাষী দিবানিশি দেশের কল্যাণ।

দরিদ্রের পর্ণকুটীরে লালবিহারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অবিচলিত অধ্যবসায়, নিরতিশয় শ্রমশীলতা, প্রশংসনীয় স্বাবলম্বন এবং অপূর্ব্ব চরিত্রদার্ঢ্যগুণে তিনি নিম্নতম অবস্থা হইতে সম্মানিত উচ্চপদ অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অসীম বিদ্যানুরাগ, স্বাধীন তেজস্বিতা, ও আন্তরিক দেশহিতসাধনেচ্ছা তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। বিদেশীয় ভাষায় অসামান্য অধিকার লাভ এবং পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া তিনি বিদেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলিলাভ করিয়া "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর



স্যর রিচার্ড টেম্পল

(পরে বোম্বাইয়ের গবর্ণর) সুপণ্ডিত স্যর রিচার্ড টেম্পল তাঁহার "Men and Events of my time in India" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লালবিহারীর সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সকল বাঙ্গালীই গৌরব অনুভব করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"His character was marked by firmness, independence and ambition for doing good in his generation. Having been in intimate communication with the missionaries, he possessed an exact knowledge of the best points in the European character, and his writings displayed much insight into the thoughts and ways of the poorer classes among his countrymen. He possessed much literary skill and wrote English prose with purity and perspicuity."